বাংলাদেশের ইতিহাস

সুব্রত বড়ুয়া

প্রাচীন থেকে পলাশী

সুব্রত বড়ুয়া

আনন্দ-পঠন গ্রন্থমালা

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০০ ॥ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

বাএ ২৯৬৫

পাণ্ডুলিপি : ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

প্রকাশক : সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : মামুন কায়সার

মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প, বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-এর ব্যবস্থাধীনে
কাশবন মুদ্রায়ণ, ১ ভিতরবাড়ি লেন,
নবাবপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : পনের টাকা।

Bangladesher Itihash : Prachin Theke Palashi by Subrata Barua. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka. First Edition, February, 1994. Price : Tk 15.00.

ISBN 984-07-2974-8

উৎসর্গ

শুভময় ও সুস্মিতাকে
বাবার সস্নেহ উপহার

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রকৃতি, মানুষের জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সচেতন করে তোলা আমাদের দায়িত্ব। কাজটি করা যেতে পারে উপর্যুক্ত তথ্য-সমৃদ্ধ বই তাদের জন্য প্রকাশ করে। এ ধরনের বই হওয়া উচিত আকর্ষণীয় এবং ভাষার দিক থেকে সহজ-সরল। এ রকম বই খুব বেশি নেই। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়ে বাংলা একাডেমী আনন্দ-পঠন গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই গ্রন্থমালায় একুশটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ গ্রন্থমালার বই যাদের জন্য তারা যদি আগ্রহের সাথে এ বইগুলি গ্রহণ করে তাহলে বই ও বিষয়ের সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তা আমাদের রয়েছে। আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেশ, দেশের মানুষ এবং দেশের সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার সুপরিকল্পিত প্রয়াস এ সব বইয়ে তেমন বেশি দেখা যায় না। একাডেমী তাই এ গ্রন্থমালা প্রকাশে এগিয়ে এসেছে।

আশা করি যাদের জন্য এ বই তাদের ভালো লাগবে। তাদের জন্য পঠন যদি আনন্দময় হয় তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক

মাটি ও মানুষ

কোথা থেকে শুরু করবো বাংলাদেশের কথা? কেমন করে শুরু করবো? এ নিয়ে ভাবনা কম করি নি। কিন্তু ভাবনা করেও এর জবাব মিলে নি। বাংলাদেশ তো আর আজকের নয়! অনেক অনেক কাল আগে থেকেই এদেশে মানুষের বসবাস ছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন — পুরোনো পাথর যুগেও এদেশে যে মানুষের বসবাস ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। তখন নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বাস করত। তারা থাকতো আলাদা আলাদা জায়গায়। বাংলাদেশের এই আদি অধিবাসীদের মাথার গড়ন একটু বেশি লম্বা, নাক চওড়া এবং গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। এরা ছিল বেঁটেখাটো অথবা মাঝারি ধরনের লম্বা। তারপর আরো নানা চেহারার মানুষ বাংলাদেশে এসেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের যে শারীরিক গঠন আমরা বেশিরভাগ দেখতে পাই — তা হলো ঃ শরীরের দৈর্ঘ্য মাঝারি ধরনের, মাথার গড়ন যেমন লম্বা নয় তেমন গোলও নয়, নাক লম্বা নয় আবার চ্যাপ্টাও নয়, দেহের রঙ ঘোর কালো নয় আবার টকটকে ফর্সাও নয়। তবে সব মিলিয়ে এদেশের মানুষের শারীরিক গঠন ও চেহারার মধ্যে মোটামুটি একটি মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই মিল থেকেই আমরা বেশ সহজে বাংলাদেশের মানুষদের চিনে নিতে পারি।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ছিল বেশ কয়েকটি জনবসতি এলাকা বা জনপদ। জনপদের সীমানা অনেক সময় বেড়েছে বা কমেছে। এগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছিল আলাদা আলাদা রাজ্য। এমন রাজ্যের আয়তন যেমন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করতো, তেমনি নির্ভর করতো শাসকের যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর। প্রাচীন বাংলার যে সব জনপদের নাম আমরা জেনেছি সেগুলি হলো — বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুণ্ড্র বরেন্দ্র, রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জুড়ে রয়েছে জালের মতো নদী–নালা। বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে এসব নদী ভরে যায়। নদীর তীর উপচে পড়ে পানি। দু'পাশের জমিতে পড়ে পলি। এই পলি উর্বর করে তোলে মাটি। বাংলাদেশের মাটি তাই চিরকালই উর্বর। কম খাটুনিতেই ভালো ফসল ফলে এদেশের মাটিতে। এজন্যই যুগে যুগে নানা জায়গা থেকে এসে মানুষ বসতি করেছে এখানে। অন্যদিকে নদীই ছিল এদেশের জনপদগুলির প্রধান সীমারেখা। নদীর গতিপথ বদলে গেছে নানা কারণে। তাই রাজ্যগুলির সীমা ও আয়তনও নানা সময়ে বদলে গেছে।

মাটির গঠন বিবেচনা করে বাংলাদেশের মাটির গঠনকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) লালমাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি, (২) পলিমাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি, এবং (৩) পলিমাটিতে গঠিত নিম্নভূমি।

বাংলাদেশের উত্তর অংশের অধিকাংশ স্থানে লাল মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া লাল মাটি দেখা যায় ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার কিছু অংশে, ঢাকার সাভার এলাকায়, কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী পাহাড় এলাকায়, চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায়। পলিমাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি দেখতে পাওয়া যায় প্রায় সারা বাংলাদেশ জুড়ে। আর পলিমাটিতে গঠিত নিম্নভূমি রয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায়। এই মাটিই সবচেয়ে উর্বর। তাই এ ধরনের মাটিতে গঠিত অংশেই জনবসতি সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ সেই প্রাচীনকাল থেকেই মূলত কৃষিনির্ভর দেশ। বাংলার প্রধান শস্য ছিল ধান। এখনো ধানই বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য। ধান ছাড়াও অনেক কাল আগে থেকেই এদেশে সরিষা, ডাল ও আখের চাষ করা হতো। এছাড়া প্রচুর কার্পাসও উৎপাদন করা হতো। আরও চাষ করা হতো গম, তিল, জওয়ার, আদা, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

ফল-মূলের মধ্যে প্রধান ছিল আম এবং কলা। এ দুটিই ছিল এদেশের মানুষের প্রিয় ফল। তাছাড়া কয়েকটি এলাকায় সুপারি ও নারিকেলের গাছও লাগানো হতো প্রচুর।

লবণ উৎপাদন বাংলাদেশে বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। উপকূল এলাকায় সমুদ্রের জোয়ারের সময় লোনা পানি ভেসে আসতো। বড় বড় গর্ত করে সেই লোনা পানি ধরে রাখা হতো। তারপর রোদের তাপে বা চুলায় জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে তা থেকে তৈরি করা হতো লবণ।

এসব ছাড়াও বরেন্দ্রভূমিতে এলাচের চাষ করা হতো ব্যাপকভাবে। মরিচ, তেজপাতা ও লাক্ষার চাষ হতো প্রায় সারা বাংলাদেশে।

মাছ ছিল বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় খাদ্য। নদী-নালা-খাল-বিল ও হাওরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মাছ ও ভাত ছিল এদেশের মানুষের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। এখনো এই মাছ ও ভাতই বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত এবং এক টুকরা মাছ ও সামান্য তরকারি পেলেই এদেশের সাধারণ মানুষ তেমন আর কিছু চায় না। সহজ সরল খাবার এবং সহজ সরল জীবন — বাংলাদেশের মানুষের সকল চাওয়ার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়।

বাংলাদেশের মানুষ গ্রামেই বাস করে বেশি। আগেকার দিনে এদেশে নগর বা শহর তেমন বেশি ছিল না। গ্রামের মানুষেরা ঘর-বাড়ি বানাতো মাটি, খড়, বাঁশ,

কাঠ ইত্যাদি দিয়ে। বেশির ভাগ বাড়ির চাল তৈরি করা হতো খড় দিয়ে। বেড়া তৈরি করা হতো বাঁশের চাঁচারি দিয়ে আর খুঁটি হতো বাঁশ কিংবা কাঠের। তবে উত্তর বাংলায় মাটির দেয়ালের বাড়িই ছিল বেশি। আবার পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ বাড়ির বেড়া ছিল বাঁশের চাঁচারির। ধনী লোকেরা তৈরি করতো দোচালা ছনের ঘর। চালগুলি প্রায় একফুট পুরু করে ছন দিয়ে ছাওয়া হতো। খুব ধনী লোকেরা ছনের ছ'চালা, আটচালা ঘরও তৈরি করতো। এসব ঘরে থাকতো সাধারণত ২৮টি খুঁটি।

প্রাচীন বাংলার বেশ কয়েকটি নগরের কথা আমরা জেনেছি। সব নগর ছিল বড় রাস্তা না নদীর ধারে। শাসনকার্য, বাণিজ্য ও সামরিক প্রয়োজনেই এসব নগর গড়ে উঠেছিল। নগরগুলির বাড়িঘর ছিল বেশির ভাগ ইট ও কাঠের। ইটের তৈরি বাড়ির সংখ্যা ছিল খুবই কম। নগরে বাস করতেন রাজা বা শাসনকর্তা এবং তাঁর সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা। আরো থাকতো বিভিন্ন পেশার লোকেরা।

অন্যদিকে গ্রামের লোকেরা থাকতো কাছাকাছি বাড়িঘর তৈরি করে। তাদের চাষের জমিগুলোও ছিল বাড়ির কাছাকাছি। বনের জন্তুর আক্রমণ এবং চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তারা বাস করতো একসাথে কাছাকাছি। তবে পাড়াগুলি ভাগ হয়েছিল পেশা, ধর্ম ও বর্ণ ইত্যাদির ওপর। প্রতিটি গ্রামেই নানারকম কুটিরশিল্প ছিল। চাষের লাঙল, কাস্তে, দা ইত্যাদি তৈরি করতো কামারেরা। কুমোররা তৈরি করতো হাঁড়ি-পাতিল। তাঁতি বা জোলারা বুনতো কাপড়। এভাবে নিজেদের প্রয়োজনের জিনিস নিজেরাই মোটামুটি তৈরি করতো তারা।

নদীর দেশ বাংলাদেশে নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান উপায়। ভাটি এলাকায় নৌযানের ব্যবহারই ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এবং এক নগর থেকে অন্য নগরে যাবার জন্য বেশ কিছু রাস্তাও ছিল। এসব রাস্তা ধরে যাবার সময় ফেরী-নৌকায় উঠে নদী পার হতে হতো। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরনের নৌকা ব্যবহার করতো লোকেরা। এসব নৌকা দেখতে যেমন নানা রকমের, তেমনি বানানোর সময়ও নানা রকম কৌশল ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশে এখনো এমনি নানা ধরনের নৌকা ব্যবহার করা হয়।

সেকালে সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতো। তবে মালামাল আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার করতো গরুর-গাড়ি। দূরে যাবার সময়ও গরুর-গাড়িতে চড়ে যেতো তারা।

অভিজাত লোকেরা ঘোড়ায় চড়তেন, আবার ঘোড়ায় টানা এক ধরনের গাড়ি বা রথও ব্যবহার করতেন তাঁরা। অভিজাত ঘরের মেয়েরা কাছে অথবা দূরে আসা-যাওয়ার জন্য পাল্‌কি ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে রাজা এবং জমিদাররা

হাতিতে চড়ে বেড়াতে যেতেন। লড়াই এবং শিকার করার সময়ও তাঁরা হাতি ব্যবহার করতেন।

বাংলায় সেই প্রাচীন কালেও বেশ ক'টি সড়কপথ ছিল। এখন থেকে প্রায় তেরোশ' বছর আগে চীন দেশ থেকে বেড়াতে এসেছিলেন যুয়ান চোয়াং। তিনি তাঁর রচনায় এ দেশের রাস্তাঘাটের কথা লিখেছেন। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে যাবার তিনটি পথ ছিল। একটি পথ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ) থেকে মিথিলা (উত্তর বিহার) হয়ে বর্তমান উত্তর-ভারত পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথটি তাম্রলিপ্তি থেকে রাজমহল হয়ে বর্তমান পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তৃতীয় পথটি ছিল বুদ্ধগয়া হয়ে উত্তর-ভারতের শেষ পর্যন্ত।

চীন ও তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উত্তর-বাংলা ও কামরূপের ভেতর দিয়ে। তিব্বতের সাথে যোগাযোগের আরেকটি পথ ছিল মগধ বা বর্তমান বিহার হয়ে। আবার চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের ভেতর দিয়ে বর্মার ক্রোম পর্যন্ত একটি পথ গিয়েছিল।

সেকালের পথঘাটের এসব বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের সাথে ভারতের অন্যান্য অংশের ভালো যোগাযোগ ছিল। এসব পথ ধরে বিদেশীরা বাংলায় আসতেন। আবার বাংলাদেশের নানা জিনিস চালান হতো এসব পথ দিয়ে। অনেকে বলেন, বাংলাদেশের রেলপথগুলি এসব প্রাচীন রাস্তাঘাট ধরেই তৈরি করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার চাষাবাদের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। জমির ফসল ছাড়াও সেকালে বাংলাদেশে আরো নানা জিনিস তৈরি হতো। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে থেকেই বাংলাদেশে তৈরি কাপড়ের সুনাম ছিল অন্যান্য দেশে। এদেশে কার্পাসের চাষ হতো বহু জায়গায়। গুটিপোকার চাষ করা হতো রাজশাহী এলাকায়। কার্পাসের কাপড় এবং রেশমী কাপড় — দুটিই তৈরি হতো বাংলাদেশে। তবে এদেশে সবচেয়ে দামি যে কাপড় তৈরি হতো তার নাম মসলিন। মসলিন যেতো বহু দেশে। মসলিনের সুনাম ছিল জগৎজোড়া। প্রাচীন বাংলায় পাটের আঁশ থেকে একপ্রকার কাপড় তৈরি করা হতো। এ কাপড়ের নাম ছিল পট্টবস্ত্র। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজের সময় এ কাপড় ব্যবহার করার রীতি ছিল।

অবাক করার মতো একটি খবর — প্রাচীন বাংলায় চিনি উৎপাদিত হতো এবং সে চিনি বিদেশে পাঠিয়ে অনেক টাকা-পয়সা পাওয়া যেত। পর্তুগালের একজন পর্যটক রাবরোসার বিবরণ থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতকের গোড়াতেও বাংলার

চিনি নিয়ে যাওয়া হতো ভারতের অন্য কয়েকটি দেশে, শ্রীলংকায়, ইরানে ও আরব দেশে।

পাথর বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। তবু পাথরের তৈরি নানা রকম মূর্তি এখনো এদেশের নানা জায়গায় পাওয়া যায়। নবম থেকে দশম শতকে পাথরের মূর্তি তৈরির কাজে বাংলাদেশের লোকেরা বেশ সুনাম পেয়েছিল। প্রায় হাজার বছর আগের কষ্টিপাথরের তৈরি এসব মূর্তি এখনো চমৎকার কাজ হিসেবে সমাদর পায়। এদিকে পোড়ামাটির কাজে বাংলার কারিগরদের নাম এখনো আছে। অনেক জায়গায় পোড়ামাটির ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। প্রাচীন মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের কিছু নিদর্শন এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিস বাংলায় চালু ছিল। সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বনে প্রচুর হাতি ছিল। তাই হাতির দাঁত ছিল এখানে সুলভ। হাতির দাঁত থেকে অনেক সৌখিন জিনিস সেকালে তৈরি করা হতো এদেশে।

বাংলাদেশের অনেক জিনিস পাঠানো হতো নানা দেশে। বাঙালি বণিকদের বাণিজ্যতরী সাগরের কূল ঘেঁষে অনেক দূরদেশে যেত। বণিকেরা নিয়ে যেতেন লবণ, কাপড়, তেজপাতা ও চিনি। আরও নিয়ে যেতেন পান, সুপারি ও নারিকেল।

মাঝখানে কিছুকাল বাংলার নৌ-বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল। তবে মুসলিম শাসনামলে আবার বাংলার বাণিজ্যতরী আরো বেশি করে বিদেশ যেতে শুরু করে। আরব বণিকেরা বাংলার নানা পণ্য বহু দূরদেশে নিয়ে যেতে থাকেন।

গঙ্গানদীর মোহনায় গঙ্গা নামে একটি বন্দর ছিল প্রাচীন বাংলায়। পরে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক হয়ে ওঠে প্রধান বন্দর। পলি জমে একসময় এ বন্দরটি অচল হয়ে যায়। এর বদলে অনেক পরে ভাগীরথী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম এবং দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম এখন বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর।

কাঠের কাজে বাংলার কারিগরদের হাত ছিল বেশ পাকা। কাঠের কাজের কারিগরদের বলা হতো সূত্রধর বা ছুতোর। কিন্তু তাঁরা কেবল ঘর-বাড়ি তৈরি বা আসবাবপত্র বানানোর কাজই করতেন না। বাড়িঘরে প্রতিদিনের কাজে ব্যবহারের নানা জিনিসও তাঁরা তৈরি করতেন। আবার খোদাই করে অনেক সৌখিন জিনিসও তাঁরা তৈরি করে দিতেন অভিজাত ও ধনী মানুষদের জন্য। বাংলার কাঠের কারিগররা নানা ধরনের নৌকা তৈরি করতেন। সপ্তডিঙা মধুকরের নাম এখনো আমরা অনেক কাহিনীতে শুনে থাকি। তাছাড়া এক এক এলাকায় এক এক ধরনের নৌকার প্রচলন ছিল। মহাজনী নৌকা যেমন অনেক বড় ছিল, তেমনি এগুলো চলতোও ধীরে, পাল খাটিয়ে। অন্যদিকে ছিপ বা কোষা নৌকা বৈঠা মেরে চালানো

হয়, চলেও খুব তাড়াতাড়ি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাম্পান বিশেষ ধরনের নৌকা। এ নৌকা বাংলাদেশের অন্য কোনো অঞ্চলে দেখা যায় না।

এসব বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে ধনী ছিল। এদেশের মানুষ চাষ করে নানা রকম ফসল ফলাতো। তারা তৈরি করতো চমৎকার কাপড়। এদেশের বণিকেরা হরেক রকম সওদা নিয়ে পাড়ি দিত সাগর। সেসব ছিল বাংলাদেশের পরম সুখের দিন। কেমন পোশাক পরতো সেকালের বাংলাদেশের মানুষেরা? সেই অনেক আগের কথা বলছি? আজ থেকে এক হাজার দু'হাজার বছর আগের দিনের কথা। এর পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন ইতিহাস লেখকেরা। পোড়ামাটির টুকরোয় আঁকা ছবি আর তালপাতার পুথির পাতা থেকে সে বিবরণ পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বিবরণ থেকে আমরা এসব জেনেছি।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের পুরুষেরা সাধারণত ধুতি পরতো। ধুতি পরা হতো কাছা দিয়ে এবং খাটো করে। লুঙ্গি এবং পাজামাও পরতো অনেকে। মেয়েরা পরতো শাড়ি। শাড়ি পরার ধরনটা ছিল অনেকটা একালের মতো। তবে শরীরের উপরের অংশে শাড়ি পেঁচানো হতো না। তার বদলে বডিসের মতো জামা পরতো তারা। গরীব লোকেরা বেশিরভাগ পরতো নেংটির মতো এক টুকরা কাপড়। কাজের সময় এটিই ছিল তাদের পোশাক। প্রায় খালি গায়েই থাকতো তারা তখন। আবার সৈনিক ও কুস্তিগীররা খাটো ধরনের আঁটা পাজামা পরতো। শাড়ি, ধুতি ও চাদরে নানা রকম নক্‌শা আঁকা থাকতো। অনেক সময় অভিজাত ধনী লোকেরা মিহিন কাপড় কিংবা রেশমের কাপড় পরতো।

পুরুষরা লম্বা করে চুল রাখতো অনেকেই। কোনো কোনো সময় সে চুল তারা মাথার উপর চূড়ার মতো করে বেঁধে রাখতো। মেয়েরা লম্বা চুল রাখতো। হাল্‌কা করে খোঁপা বাঁধতো। আবার কখনো ফিতা দিয়ে মাথার উপর বড় খোঁপা করতো। মেয়েরা নানা রকম গহনা পরতো হাতে, বাহুতে ও গলায়। ধনী পরিবারের পুরুষরাও হাতে ও বাহুতে গহনা পরতো।

মেয়েরা চুলে তেল দিতো। কপালে কাজলের ফোঁটা ও চোখে কাজল দিতো। পায়ে লাগাতো আলতা। প্রসাধন হিসেবে তারা ব্যবহার করতো চন্দনের গুঁড়া, জাফরান ও মৃগনাভি।

পাদুকার ব্যবহার সীমিত ছিল। সেনানী ও পাহারাদাররা চামড়া দিয়ে তৈরি পাদুকা পরতো। রাজা, জমিদার ও রাজকর্মচারীরা চামড়ার পাদুকা পরতো। তবে সাধারণ মানুষেরা ব্যবহার করতো কাঠের তৈরি খড়ম।

মুসলমানদের আগমনের পর পোশাকের কিছু পরিবর্তন ঘটে। তারা সাদা রঙের লম্বা সুতি জামা গায়ে দিতো এবং মাথায় সাদা সুতি কাপড়ের পাগড়ি

পরতো। মাথার চুল তারা কেটে ছোট করে ফেলতো। অভিজাত মুসলিমরা পরতো ভেড়ার চামড়ার তৈরি চটিজুতা। এগুলোর ওপর থাকতো সোনালি জরির কাজ। মুসলিম পরিবারের মেয়েরা খাটো জামা পরতো এবং জামার চারদিকে জড়াতো সুতি বা রেশমী কাপড়ের ওড়না। তারা গায়ে, হাতে বা মুখে তেমন কোনো কিছু মাখতো না। তবে গহনা ব্যবহার করতো তারা নানা রকম। কানে পরতো পাথর বসানো সোনার দুল, গলায় পরতো হার, হাতে সোনার বালা, পায়ের গোড়ালিতে মল এবং পায়ের আঙুলে আংটি। তারা মাথার পেছন দিকে খোঁপা করে চুল বেঁধে রাখতো।

তবে পোশাক-আশাকে এই অমিল ছিল সাধারণত অভিজাত বা বড় লোকদের মাঝেই। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের পোশাক-আশাকের তেমন বেশি অমিল মোটেই ছিল না।

গরীব ও সাধারণ পরিবারের মেয়েরা ঘরের কাজ ছাড়াও বাইরের কাজ করতো। চাষ-বাসের কাজে তারা পুরুষদের সাহায্য করতো। সওদা কেনা-বেচা করার জন্য হাট-বাজারে যেত। তবে ধনী ও অভিজাত পরিবারের মেয়েরা সাধারণত বাড়ির বাইরে যেত না। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত কম বয়সেই। বিয়ে ভাঙ্গা যেত না। মুসলমান সমাজে তালাক দেয়ার রীতি ছিল। কিন্তু খুব কমই তা ঘটতো। গরীব ও সাধারণ পরিবারের মেয়েরা তেমন বেশি পর্দা করতো না। আবার অভিজাত ও ধনী পরিবারের মেয়েরা খুব কড়াকড়িভাবে পর্দা মানতো।

প্রাচীন বাংলায় হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল না বলেই জানা যায়। ১৩শ শতক থেকেই সতীদাহ ঘটনার কথা জানতে পারা গেছে। সমাজে মেয়েদের সম্মান ছিল। তবে তাদের স্বাধীনতা তেমন ছিল না।

বাড়িতে নানা কাজে মেয়েদের মতামতের দাম ছিল। বিশেষ করে সাধারণ পরিবারে মেয়েরা তাদের মতামত খাটাতে পারতো।

প্রাচীন বাংলার রাজ্য

আদি যুগে বাংলার সমাজ ছিল কৌম সমাজ। এর অর্থ তখন রাজা বা রাজ্য বলতে কিছু ছিল না। লোকেরা সবাই এক-একটি জায়গায় মিলে-মিশে থাকতো। একটি জায়গার মানুষদের এই একসাথে থাকাটাই কৌম সমাজ নামে পরিচিত। জমির মালিক ছিল সমাজের সবাই। কেউ আলাদাভাবে জমির মালিক হতে পারতো না। চাষ-বাস করতো সবাই মিলে। সবার মতামত নিয়েই সব কাজ করা হতো। কৌম সমাজের রীতিনীতি এখনো কিছুটা রয়ে গেছে আমাদের সমাজে। সামাজিক ও

ধর্মীয় কাজে এর কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। কৌম সমাজ শেষ হয়ে যেতে শুরু করে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। ইতিহাসবিদরা বলেন, তখন থেকেই এদেশে শাসক বা রাজাদের শাসন কায়েম হয়। এভাবেই গঠিত হয়েছিল বাংলার প্রাচীন রাজ্যগুলি। এগুলোর মধ্যে যে-সব রাজ্যের কথা আমরা জানতে পেরেছি সেগুলি হচ্ছে — বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুণ্ড্র বরেন্দ্রী, রাঢ়, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি।

প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অংশের কথা আছে। একটি 'বিক্রমপুর', অপরটি 'নাব্য'। মনে হয়, বর্তমান বিক্রমপুর ও ইদিলপুর নিয়েই গঠিত হয়েছিল প্রাচীন বিক্রমপুর। আর বর্তমান ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালির নিম্ন এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ' নাব্য'। প্রাচীনকালের নানা কাহিনীতে বঙ্গ রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। এ রাজ্যটি বহুদিন ধরে টিকে ছিল। পুণ্ড্র রাজ্য ছিল বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকা জুড়ে। বগুড়ার মহাস্থানগড় ছিল রাজ্যটির রাজধানী। রাজা আশোকের সময় পুণ্ড্র মৌর্যদের অধীনে চলে যায়।

বরেন্দ্র ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যেরই একটি অংশ। বরেন্দ্রভূমি বলতে বুঝাতো বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনার কিছু অংশ। রাজশাহীর একটি অংশ এখনও 'বরিন্দ' নামে পরিচিত। প্রাচীন রাঢ় বা রাঢ়দেশ ছিল ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে। আসলে বর্তমান বাংলাদেশের কোনো অংশ রাঢ়দেশের ভিতরে ছিল না। রাঢ়দেশের দুটি অংশের নাম ছিল উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। পশ্চিম বঙ্গের কান্দি মহকুমা, বীরভূম জেলা ও বর্ধমান জেলার কাটোয়া নিয়ে গঠিত হয়েছিল উত্তর রাঢ়। আর দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে ছিল বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বেশির ভাগ এলাকা এবং হাওড়া। প্রাচীন বঙ্গের অন্যান্য অংশের তুলনায় রাঢ়দেশ তেমন উন্নত ছিল না। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দুটি ছোট বিভাগের একটির নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। প্রাচীন বাংলার একটি বিখ্যাত বন্দরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। আজ থেকে প্রায় বারো শত বছর আগে তাম্রলিপ্তির গৌরবের অবসান ঘটে।

বাংলার একটি রাজ্য বা জনপদের নাম ছিল গৌড়। কর্ণসুবর্ণ ছিল গৌড়ের রাজধানী। ইতিহাসবিদদের মতে বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমই ছিল আদি গৌড়। তবে গৌড়ের শক্তি বেড়ে যাওয়ার পর এর সীমানা আরো অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। সমতট নামটি বেশ প্রাচীন। এটি ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি প্রাচীন রাজ্য। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিরাট সমতল ভূমিরই নাম ছিল সমতট। মনে করা হয়, বর্তমান কুমিল্লার বড়কামতা ছিল রাজ্যটির একেবারে মাঝখানের জায়গা। হরিকেল নামের রাজ্যটি

ছিল প্রাচীন বাংলার পূর্ব অংশে। কেউ কেউ বলেন, বর্তমান সিলেটই ছিল প্রাচীন হরিকেল রাজ্য।

প্রাচীন বাংলার এসব রাজ্যের সীমানা নানা সময়ে নানা কারণে বদলে গিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। সামরিক শক্তি ও নানা রকম প্রভাব এর একটি কারণ। আরেকটি বড় কারণ হলো নদীর গতিপথের পরিবর্তন। নদীর পথ বদলে গেলে সীমানা বদলে যেত। লোকজন চলে যেত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে বাংলার প্রাচীন রাজ্যগুলি টিকে ছিল। এরপর সপ্তম শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হলেন। তাঁর সময়ে বর্তমান পশ্চিম বাংলার তিনটি রাজ্য এক রাজ্যে পরিণত হয়। এদিকে বর্তমান বাংলাদেশের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান হয় ওঠে পুণ্ড্র ও বঙ্গ। ধীরে ধীরে এই তিনটি রাজ্যই সেকালের বাংলায় প্রধান রাজ্য হয়ে ওঠে। শশাঙ্কের আমলে বাংলার ঐক্যের সূচনা ঘটে। অর্থাৎ সমগ্র প্রাচীন বাংলা একটি রাজ্যে পরিণত হয়। পরে পাল রাজাদের আমলে সে ঐক্য আরো জোরদার হয়। এভাবে বাংলার নিজের একটি পরিচয় ধীরে ধীরে রূপলাভ করতে থাকে। সে-সময় গৌড় নামটিই প্রধান ছিল। রাজারা নিজেদের গৌড়াধিপতি বা গৌড়েশ্বর বলতেন। কিন্তু পরে এ নামটি টিকে থাকতে পারে নি। বঙ্গ নামটিই হয়ে ওঠে প্রধান। আর এ নামেই এদেশের পরিচিতি ঘটে সুলতানী আমলে। মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলাদেশের নাম হলো সুবা বাংলা। বাংলাদেশের আপন পরিচয়ের শুরুও তখন থেকেই।

পাল রাজাদের চারশো বছর

গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের কথা আমরা আগে একটু বলেছি। তাঁর সাথে উত্তর ভারতের রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু শশাঙ্ক এসব যুদ্ধে জয়ী হন এবং তাঁর রাজ্যসীমা অটুট থাকে। প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেন। ৬৩৬ সালের শেষদিকে তিনি মারা যান। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পর তখনকার গৌড়রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলার সামন্ত রাজারা একে অন্যের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এ সুযোগে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন এবং কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁদের হাতে গৌড়ের সেনাদলের পরাজয় ঘটে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় তখন এক ভয়াবহ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ সময়কে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়েছে। অর্থাৎ বড় সামন্ত রাজারা ছোট সামন্ত রাজাদের রাজ্য দখল করেন। আবার তাঁরা নিজেরাও একে অপরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবে এ সময়ে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে অরাজক অবস্থা ছিল না। সমতটে বিভিন্ন রাজবংশের রাজারা রাজত্ব করেন প্রায় তিনশো বছর ধরে।

এদিকে প্রায় একশো বছর ধরে নানা রকম গোলযোগ ও অরাজক অবস্থা চলার পর গোপাল নামে একজন সামন্ত রাজা বাংলায় তাঁর অধিকার কায়েম করেন। গোপাল ছিলেন একজন কুশলী সমরনায়ক। ছোট-বড় সামন্ত রাজারা গোপালের কাছে নতি স্বীকার করেন। এভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়া বাংলার প্রায় সব এলাকা ও মগধ গোপালের অধিকারে চলে আসে। সূচনা ঘটে বাংলায় পাল বংশের রাজত্বের। এই বংশের রাজারা প্রায় ৪০০ বছর (৭৫০-১১৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) ধরে বাংলায় রাজত্ব করেন। কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর গোপাল মারা যান (৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে)। এরপর রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং পৌত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০)। তাঁদের শাসনকালে পাল রাজবংশের অধিকার আরো সংহত হয়। এ সময়ে পাল রাজারা বাংলায় একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। রাজ্যের শাসনকার্য চালানোর জন্য তাঁরা কাজের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা বিভাগ তৈরি করেন। এসব বিভাগের মধ্যে ছিল বিচার বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, শান্তিরক্ষা বিভাগ ও সৈন্য বিভাগ। অন্যদিকে রাজার অধীন সামন্তদের মধ্যে কয়েকটি ভাগ ছিল। এঁদের উপাধি ছিল রাজা, রাজন্যক, রানক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তবে তাঁদের প্রধানমন্ত্রীরা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রীরা বেশ ক্ষমতাবান হতেন। তাঁদের হাতে থাকতো শাসনের ভার। এজন্যে পাল যুগে আমলাদের অর্থাৎ রাজকর্মচারীদের প্রভাব ছিল বেশি।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের প্রভাব কিছুটা কমে যায়। রাজ্যের কিছু অংশও তাদের হাতছাড়া হয়। এরপর প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) আবার পাল রাজ্যের প্রভাব ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর দিব্যক নামে একজন কৈবর্ত সামন্ত পাল রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। পরে দিব্যকের ভাই রোদক ও রোদকের পুত্র ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভীমের রাজত্বকালে পালবংশীয় রাজা রামপাল ভীমকে পরাজিত করে আবার পাল বংশের শাসন কায়েম করেন। রামপালের পর পাল বংশ আবার হীনবল হয়ে পড়ে। অবশেষে মদনপালের মৃত্যুর পর (১১৪০-১১৪৪) বাংলায় পালদের শাসনের অবসান ঘটে। পালদের শাসন টিকে থাকে কেবল মগধের ছোট একটি এলাকায়।

বাংলায় যেসব রাজবংশ রাজত্ব করেছিল তাদের মধ্যে পাল বংশই সবচেয়ে বেশিদিন শাসন ক্ষমতায় ছিল। প্রায় চারশো বছর ধরে পাল বংশের শাসন ছিল বাংলায়। তাই শাসনকার্যে তাঁরা বেশ কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আনতে পেরেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা যেমন হয়েছিল, তেমনি শাসন পরিচালনার কাজেও

এসেছিল নিয়ম-নীতি। অন্যদিকে পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলে এ-সময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়। অনেক বৌদ্ধ মন্দিরও তৈরি হয়। পাহাড়পুর বিহার তৈরি হয়েছিল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে। এ সময় মূর্তি তৈরি ও ছবি আঁকার ব্যাপারে অনেকেই কুশলী হয়ে উঠেছিলেন। পোড়ামাটির ফলকে নানা ধরনের ছবি আঁকতেন তাঁরা। আর মূর্তির মধ্যে বেলে পাথর ও কালো পাথরের মূর্তিই ছিল বেশি। আবার ধাতুর তৈরি মূর্তির মধ্যে বেশি ছিল ব্রোঞ্জের মূর্তি। সেকালের বহু পোড়ামাটির চিত্রফলক এ যুগে পাওয়া গেছে। মূর্তিও পাওয়া গেছে অনেক।

সেন বংশ

পাল রাজারা যখন রাজত্ব হারান তখন সমতটে বর্মণ বংশ সবল হয়ে ওঠে। বর্মণরা এসেছিল তখনকার কলিঙ্গ বা বর্তমান উড়িষ্যা থেকে। জাতবর্মা ছিলেন এই বংশের প্রথম রাজা। বিক্রমপুর ছিল তাঁর রাজধানী। জাতবর্মার পর তাঁর ছেলে হরিবর্মা এবং হরিবর্মার পর শ্যামলবর্মা রাজা হন। শ্যামলবর্মার পুত্র ভোজবর্মার সময় বর্মণদের রাজ্য সেন রাজবংশের অধিকারে চলে যায়।

সেন বংশের লোকেরা বাংলাদেশে এসেছিলেন কর্ণাট থেকে। তাঁরা প্রথমে বাস করতে শুরু করেন রাঢ়দেশে। সামন্তসেন ছিলেন সেন বংশের আদিপুরুষ। তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা। যৌবনে দক্ষিণ-ভারত থেকে বাংলায় এসেছিলেন তিনি। তাঁর পুত্র হেমন্তসেন পাল রাজা রামপালের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন। সামন্তরা জমিদার ছিলেন। তাঁদের নিজেদের সেনাবাহিনী থাকতো। রাজাকে তাঁরা প্রয়োজন মতো সাহায্য করতেন। এই হেমন্তসেনের পুত্র বিজয় সেনই বাংলায় সেন বংশের রাজত্ব কায়েম করেন।

আমরা আগেই বলেছি — রামপাল মারা যাওয়ার পর পাল বংশের অবনতি শুরু হয়। পাল রাজ্যের অনেক সামন্ত এ সময়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করেন। বিজয়সেনও এ সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। তিনি প্রথমে রাঢ়দেশের অন্য সামন্তদের পরাজিত করেন। তারপর বর্মণদের পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ দখল করেন। সবশেষে পাল রাজাদের কাছ থেকে অধিকার করেন গৌড়। এভাবে প্রায় সারা বাংলা সেন বংশের দখলে চলে আসে। বিজয়সেন ১১৫৫ সালের দিকে সারা বাংলা তাঁর অধিকারে নিয়ে এসেছিলেন। এর পর তিনি ৫ বছর ধরে রাজত্ব করেন। বিজয়সেন মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালসেন রাজ্যের সীমানা আরো বাড়িয়ে মগধ পর্যন্ত তাঁর অধিকার নিয়ে আসেন। তিনি প্রায় ১৮ বছর রাজত্ব করেন। বল্লালসেন দুটি বইও লিখেছিলেন।

বই দুটির নাম 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর'। শেষ জীবনে বল্লালসেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ করেন।

লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। যৌবনে তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পিতামহ বিজয়সেনের রাজত্বকালে তিনি অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতাও রচনা করতেন। তাঁর রাজসভায় অনেক পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রায় ২৬ বছর পর ইখতিয়ার-উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নামে একজন তুর্কী সেনাপতি নদীয়া আক্রমণ করে গৌড় রাজ্য দখল করেন। লক্ষ্মণসেন তখন নদীয়ায় ছিলেন। তিনি নদীপথে পালিয়ে বিক্রমপুরে চলে যান। সেখানে আরো দু'বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ১২২৩ সাল পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। এরপর বিক্রমপুরও মুসলিম অধিকারে চলে যায়।

সুলতানী আমল

ইখতিয়ার-উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করেছিলেন মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে। নদীয়া জয়ের পর তিনি সমগ্র গৌড় রাজ্য জয় করেন। এরপর তিনি উত্তর বাংলায় অভিযান চালান। তিনি পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দোকোট হয়ে রংপুর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত জয় করেন। ১২০৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইখতিয়ার-উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর মালিক ইয়যুদ্দিন মুহম্মদ শিরান খলজী গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন আলী মর্দান নামে একজন আমীর বরসালের শাসনকর্তা ছিলেন। শিরান খলজী আলী মর্দানকে পরাজিত ও বন্দী করেন। এদিকে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে খলজী আমীরদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ সুযোগে আলী মর্দান কারাগার থেকে পালিয়ে যান। তারপর তিনি দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবকের কাছে যান। তাঁর পরামর্শে দিল্লীর সুলতান রুমী হুসাম উদ্দীন ইওজ খলজীকে গৌড় তথা লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি দু'বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এরপর গৌড়ের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন আলী মর্দান। ইওজ খলজী বিনা বাধায় তাঁর হাতে শাসনভার ছেড়ে দেন।

এদিকে কুতুবউদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিবাদের সুযোগে আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু আলী মর্দান ছিলেন

অত্যাচারী শাসক। খলজী আমীররা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। ইওজ খলজীর নেতৃত্বে আমীররা আলী মর্দানকে পরাজিত করেন। আলী মর্দান এরপর খলজী আমীরদের দ্বারা নিহত হন। এবার হুসামউদ্দীন ইওজ খলজী সিংহাসনে বসেন। তিনি সুলতান হিসেবে গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী নাম গ্রহণ করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন সুশাসক ছিলেন। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি দেশ শাসন করেন। খলজী–মালিকদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তিনি তারও অবসান ঘটান। তিনি বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন। যাতায়াতের জন্য অনেক রাস্তা তিনি তৈরি করান, পুরোনো রাস্তা নতুন করে গড়ে তোলেন। সুশাসক ছিলেন বলে সুলতান গিয়াসউদ্দীন ধীরে ধীরে প্রজাদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। দিল্লীর অধীন থাকলেও তিনি অনেক বিষয়েই নিজের মতো করে কাজ করতেন। এর ফলে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিশ ১২২৫ সালে বিশাল বাহিনী বিহার ও বাংলা জয়ের জন্য অগ্রসর হন। গিয়াসউদ্দীন ইওজ তখন ইলতুৎমিশের কাছে গিয়ে তাঁর অধীনতা মেনে নেন। কিন্তু ইলতুৎমিশ দিল্লী ফিরে যাবার পর তিনি আবার স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে থাকেন। এরপর ১২২৭ সালে ইলতুৎমিশ–এর পুত্র অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন বাংলা আক্রমণ করে গিয়াসউদ্দীন ইওজকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এভাবেই বাংলায় খলজী মালিকদের শাসনের অবসান ঘটে। বাংলাদেশ পরিণত হয় দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশে। তখন থেকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা সরাসরি দিল্লীর অধীন ছিল।

এই ষাট বছরে মোট পনের জন তুর্কী শাসক বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে দশজন ছিলেন মামলুক বা ক্রীতদাস। এঁরা দিল্লীর অধীনে থাকলেও নিজেদের মাঝে মাঝে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতেন।

দিল্লীর সিংহাসনে যদি কোনো দুর্বল সুলতান বসতেন তাহলে আমীরদের ক্ষমতা বেড়ে যেত। তাঁরা সবাই নিজের নিজের প্রভাব বাড়াতে চাইতেন। এর ফলে দলাদলিও হতো। অনেক সময় তাঁরাই সুলতান হিসেবে কাউকে মনোনীত করতেন। আবার পছন্দ না হলে তাঁকে বাদ দিতেন। দিল্লীর সুলতান সবল না হলে প্রদেশের শাসকরা অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এদিক থেকে বাংলার গভর্নর বা লখনৌতির শাসকরা আরো বেশি সুবিধা ভোগ করতেন। কারণ বাংলা ছিল দিল্লী থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া যাতায়াতের পথও তেমন ভালো ছিল না। বাংলার শাসনভার পেলে অধীনতা অনেক কম থাকতো বলে দিল্লীর সুলতানের আমীরদের অনেকেই এ পদটি পেতে চাইতেন। এ নিয়েও তাঁদের মধ্যে বিবাদ বাধতো।

এইসব কারণে তুর্কী শাসকদের আমলে সারা বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম করা যায় নি। তখনো অনেক হিন্দু রাজা বাংলার নানা স্থানে রাজত্ব করতেন।

তাঁদের সাথে তুর্কী শাসকদের যুদ্ধও হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে মুসলিম শাসনের প্রতি বাংলার সাধারণ মানুষের মনোভাব বদলে যায়। মুসলিম শাসকরা সাধারণ মানুষদের উপকার করার নীতি গ্রহণ করেন। অনেক জনহিতকর কাজও তাঁরা করেন।

১২২৭ সালে নাসিরউদ্দীন লখনৌতি জয় করেছিলেন। তিনি দেড় বছর লখনৌতির শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দওলত শাহ্ নামে একজন সেনাপতি শাসনভার হাতে নেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খলজি নামে অপর একজন সেনাপতির হাতে তিনি নিহত হন। এরপর ইলতুৎমিশ নিজেই বলকা খলজিকে দমন করেন। বাংলার শাসনভার পেলেন মালিক আলাউদ-দীন জানী। এক বছর পর তাঁর জায়গায় এলেন মালিক সাফ-উদ-দীন আইবক। তিনি লখনৌতিতে ছিলেন তিন বছর। তাঁর মৃত্যুর পর আওর খান লখনৌতির শাসনভার হাতে নেন। তখন বিহারের শাসনকর্তা তুগরিল তুগান খান লখনৌতির শাসন পরিচালনা করেন। ১২৪৫ সালে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব লখনৌতি অভিযান করেন। তখন অযোধ্যার শাসক মালিক ওমর খান দিল্লীর সুলতানের আদেশে লখনৌতির সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পরে তিনি নিজেই লখনৌতির শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। ওমর খান দু'বছর (১২৪৫-১২৪৭) লখনৌতি শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর লখনৌতির শাসনভার পান জমিলুদ্দীন জানী (১২৪৭-১২৫১)। তিনি চার বছর লখনৌতি শাসন করেন। এরপর লখনৌতি শাসন করেন মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন উযবক (১২৫১-১২৫৭), মালিক ইয়যুদ্দীন উযবক (১২৫৭-১২৫৯), তাজ-উদ-দীন আরসলান খান (১২৫৯-১২৬৫), তাতার খান (১২৬৫-১২৬৮) এবং শের খান (১২৬৯-১২৭২) প্রমুখ।

১২৬৬ সালে সুলতান নাসিরউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আমীন খানকে লখনৌতির গভর্নর এবং তুগরল খানকে সহকারী গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু তুগরল খান কিছুদিন পর আমীন খানকে সরিয়ে দিয়ে লখনৌতির শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। তিনি মুগীমউদ্দীন নাম ধারণ করে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লী থেকে দু'বার সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। তিনি দু'বারই তাদের পরাজিত করেন। অবশেষে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন নিজেই বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে লখনৌতি অভিযানে আসেন ১২৮০ সালে। তুগরল বলবনের হাতে নিহত হন। এরপর বলবনের দ্বিতীয়পুত্র বুগরা খান ১২৮১ থেকে ১২৮৭ পর্যন্ত লখনৌতির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বুগরা খান ১২৯১ সাল পর্যন্ত স্বাধীন সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র রুকন-উদ্দীন কায়কাউস। তিনি ন'বছর রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে রাজ্যের সীমা

বর্ধিত হয় পশ্চিমে বিহার, উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত। কিন্তু ১৩০০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় বলবন বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর সুলতান শামসউদ্দীন ফীরূয শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৩০১ থেকে ১৩২২ সাল পর্যন্ত একুশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকালে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়। এ সময় হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেটে আসেন।

ইলিয়াস শাহী বংশ

১৩২২ সালে সুলতান শামসউদ্দীন ফীরুয শাহ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা একে অপরের সাথে বিবাদ শুরু করে। এই সুযোগে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক আবার বাংলায় দিল্লীর অধিকার কায়েম করেন। ১৩৩৮ সালে বাংলার শাসনকর্তা বাহরাম খান মারা যান। তখন তাঁর একজন সেনাপতি সুলতান ফকর-উদ্দীন মুবারকশাহ উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁও-এর সিংহাসন দখল করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অভিযান চালান এবং চট্টগ্রাম এলাকা তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন।

এদিকে লখনৌতিতে সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ তাঁর অধিকার কায়েম করেন। তিনি লখনৌতি থেকে রাজধানী নিয়ে আসেন ফিরূযাবাদে। তবে বেশিদিন তিনি বাঁচতে পারেন নি। ১৩৪২ সালে হাজী ইলিয়াসের হাতে তিনি নিহত হন। হাজী ইলিয়াস তখন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে ফিরূযাবাদের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় থেকেই বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের শুরু। ইলিয়াস শাহ সারা বাংলা তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। বাংলার বাইরেও কয়েকটি এলাকা তিনি দখল করেন। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন উদার। তাঁর আমলে বাংলার সাধারণ মানুষ সুবিচার পেতে থাকে। এর ফলে সবাই তাঁকে সহযোগিতা করতে শুরু করে।

১৩৫৩ সালে দিল্লীর সুলতান ফিরূয শাহ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে এগিয়ে আসেন। ইলয়াস শাহ তখন একডালা দুর্গের ভেতরে চলে যান। এ দুর্গটি ছিল বেশ শক্ত ও সুরক্ষিত। ফিরূয শাহ একডালা দুর্গ ঘিরে বসে থাকলেন। কিন্তু দুর্গ তিনি দখল করতে পারলেন না। অবশেষে দিল্লী ফিরে গেলেন তিনি। এরপর ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতানকে অনেক দামী উপহার পাঠিয়ে দেন। সুলতান ফিরূয শাহও তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন আর বাংলায় আসেন নি।

ইলিয়াস শাহ মারা গেলে ১৩৫৮ সালে তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময় ফিরূয শাহ তুঘলক আবার বাংলা আক্রমণ

করেন। পিতার মতো সিকান্দার শাহও রাজধানী ছেড়ে একডালা দুর্গের ভেতরে চলে যান। ফিরূয শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করেন। উভয়ের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু জয়-পরাজয় কারোরই হয় না। অবশেষে সিকান্দার শাহ এবং ফিরূয শাহ তুঘলক দুজনেই লড়াই থামিয়ে সমঝোতা করে নেন।

সিকান্দার শাহ বাংলার সুলতান হিসেবে ৩৩ বছর রাজত্ব করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য অনেক কাজ করেন তিনি। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ তাঁর অমর কীর্তি। দিনাজপুরের দেবীকোটে মোল্লা আত্তার দরগায়ও তিনি একটি মসজিদ তৈরি করেন। গুণী লোকদের তিনি সমাদর করতেন।

সুলতান সিকান্দার শাহের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ্দীন আযম শাহ। পিতা এবং পিতামহের মতো তিনিও ছিলেন সুযোগ্য সুশাসক। তিনি সুফী সাধকদের খুবই সম্মান করতেন। গুণীজন এবং কবিদের সমাদর করতেন তিনি। এছাড়া সুবিচারের জন্য তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। বহু টাকা খরচ করে তিনি মক্কায় একটি মুসাফিরখানা তৈরি করে দিয়েছিলেন। গিয়াস-উদ্দীন আযম শাহের সময়ে চীনের রাজদূত বাংলায় এসেছিলেন এবং বাংলার রাজদূত চীনদেশে গিয়েছিলেন।

গিয়াস-উদ্দীন আযম শাহের রাজত্বের শেষ দিকে ভাতুড়িয়া পরগনার জমিদার রাজা গণেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। আযম শাহ মারা যাওয়ার পর ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন সুলতান কয়েক বছর রাজত্ব করেন। এরপর ১৪১৪ সালে রাজা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন। তখন বিখ্যাত সুফী হযরত নূর কুতুবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের অনুরোধ জানান। রাজা গণেশ যুদ্ধে পরাজিত হন। এর ফলে তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ইব্রাহীম শর্কি চলে যাওয়ার পর রাজা গণেশ আবার নিজেই সিংহাসনে বসেন। ১৪১৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন সুলতান জালালুদ্দীন সিংহাসন লাভ করেন।

তিনি ১৪৩১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। জালালুদ্দীন সাহসী, উদার ও কুশলী ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর পুত্র সুলতান শামস-উদ্দীন আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এগার বছর রাজত্ব করার পর ১৪৪২ সালে তিনি ঘাতকের হাতে নিহত হন। এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন সুলতান বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁরা হলেন নাসির-উদ্দীন মাহমুদ (১৪৪২-১৪৫৯), তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), শামস-উদ্দীন আবু মুজাফ্ফর ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-

১৪৮১)। ইউসুফ শাহের পর এই বংশের সুলতানরা আর তেমন প্রভাবশালী হতে পারেন নি। অবশেষে ১৪৮৭ সালে ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ হাবশীদের হাতে নিহত হন।

এরপর চারজন হাবশী ক্রীতদাস ছ'বছর বাংলায় রাজত্ব করেন। তাঁরা দেশ শাসন করার সময় সারা দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। দেশের মানুষ এতে খুব ক্ষেপে যায়। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন শেষ হাবশী সুলতান মুজাফ্‌ফর। তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন এবার দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নাম নিয়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সূচনা হয় হোসেন শাহী বংশের রাজত্ব।

হোসেন শাহী বংশ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে বসার পর বাংলায় এক নবযুগের সূচনা হয়। প্রথমে তিনি কঠোর হাতে দেশের ভিতরে বিরোধীদের দমন করেন। এরপর রাজ্যের সীমা বাড়াতে এগিয়ে আসেন। তিনি কামরূপ-কামতা জয় করেন এবং আসামে অভিযান চালান। এদিকে চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে আরাকানীদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম আবার দখলে নিয়ে আসেন তিনি। চট্টগ্রাম দখল করার ফলে সারা বাংলায় তাঁর অধিকার কায়েম হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সুশাসনে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।

সুশাসক হিসেবে সুনাম ছাড়াও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আর একটি পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন জ্ঞানের অনুরাগী এবং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সেনাপতি পরাগল খান ও ছুটি খানের সহায়তায় 'মহাভারত' প্রথম বাংলায় অনুবাদ হয়। হোসেন শাহ গুণীর কদর করতেন। তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যে মালাধর বসু 'গীতা' ও 'পদ্মপুরাণ' বাংলায় অনুবাদ করেন। হোসেন শাহ তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। মালাধর বসু ছাড়াও অন্য যাঁরা হোসেন শাহের সমাদর লাভ করেন তাঁরা হলেন বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত ও যশোরাজ খান। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য হোসেন শাহ যে কাজ করেছেন সেজন্য তিনি আজ অবধি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

হোসেন শাহ সুদীর্ঘ ২৬ বছর বাংলার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এ সময়ে তিনি সারা দেশে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা খানকাহ, মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি করেন। বিভিন্ন দরগা এবং মসজিদের জন্য তিনি অকাতরে টাকা-পয়সা খরচ করতেন। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ তাঁর এক অমর কীর্তি।

হোসেন শাহ উদার নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি যোগ্যতার বিচার করতে জানতেন। তাঁর সময়ে অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে কাজ করতেন। তাঁর শাসনকালের বিশেষ একটি ঘটনা হচ্ছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নদীয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। তিনি ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। চৈতন্যদেব বিনা বাধায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেন।

হোসেন শাহ ছিলেন মহৎ হৃদয়ের মানুষ। তিনি জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এতে দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু হোসেন শাহের রাজত্বকাল ছিল বাংলার ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ। অনেক ইতিহাসবিদ তাঁকে মধ্যযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন। এই মহান সুলতান ১৫১৯ সালে পরলোক গমন করেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নসরত শাহ সুলতান নাসির উল-দুনিয়া ওয়াল-দীন আবুল মুজফফর নসরত শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় দিল্লীর ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। দিল্লীর সুলতান ইব্রাহীম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে জৌনপুর ও বিহারে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নসরত শাহ তাঁর রাজ্যের সীমা আজমগড় পর্যন্ত বাড়িয়ে ফেলেন। এদিকে ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে মোঘল বীর বাবর দিল্লীর সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করেন। আফগানরা তখন দিল্লী-আগ্রা ছেড়ে পালাতে থাকে। নসরত শাহ অনেক আফগানকে আশ্রয় দেন। ফলে দিল্লীর শাসক মোঘল সম্রাট বাবর তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৫২৯ সালে গোগরা নদীর তীরে এক যুদ্ধে নসরত শাহ মোগল বাহিনীর হাতে পরাজিত হন। তখন তিনি মোঘলদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এরপর ১৫৩২ সালে নসরত শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন। পিতার মতো নসরত শাহও ছিলেন উদার ও সাহসী এবং সুশাসক। সাহিত্য এবং শিল্পের অনুরাগীও ছিলেন তিনি।

নসরত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরূয শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মাত্র নয় মাস রাজত্ব করার পর তাঁর চাচা গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের হাতে তিনি নিহত হন। এবার বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ। প্রায় পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর মাহমুদ শাহ ১৫৩৮ সালে আফগান বীর শের শাহের হাতে পরাজিত হয়ে রাজ্য হারান। তাঁর পরাজয়ের সাথে সাথেই বাংলার স্বাধীন হোসেন শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হয়। তবে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালের একটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশে পর্তুগিজদের

বাণিজ্যকুঠি স্থাপন। পর্তুগিজরা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং নসরত শাহের রাজত্বকালেও বাংলাদেশে ঘাঁটি বসানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন তারা সে সুযোগ পায় নি। মাহমুদ শাহ যখন শের শাহের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, তখন তিনি পর্তুগিজদের সাহায্য নেন। পর্তুগিজরা তাদের ঘাঁটি বসানোর শর্তে মাহমুদ শাহকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

মাহমুদ শাহও হোসেন শাহী বংশের অন্যান্য সুলতানের মতো সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মনে করা হয় যে, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁর সময়েই 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন।

বাংলায় হোসেন শাহী বংশের শাসন বজায় ছিল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। এই চল্লিশ বছর ছিল বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়। এ সময় শাসন ব্যবস্থা ছিল সুসংহত। শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিও ঘটেছিল। দেশের ভিতরে তেমন কোনো বিরোধ বা গোলযোগও ছিল না। সুশাসনের ফলে বাংলায় সাধারণ মানুষের অবস্থাও ছিল বেশ ভালো।

আফগান শাসন

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে মোঘল বীর বাবর দিল্লীর সুলতান ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করেন। দিল্লীতে মোঘল শাসনের শুরু তখন থেকেই। বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন ১৫২৬ সালে। তিন বছর তিনি রাজত্ব করেন। বাবর দিল্লীর সিংহাসন পেলেও ভারতের সব জায়গায় মোঘল শাসন পুরোপুরি কায়েম করতে পারেন নি। ১৫৩০ সালে সম্রাট বাবর মারা যান। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন।

হুমায়ুন তাঁর পিতার মতো কুশলী সমরনায়ক ছিলেন না। তাছাড়া ভারতের অনেক জায়গায় তখনো আফগান রাজত্ব কায়েম ছিল। অনেক রাজ্য ছিল প্রায় স্বাধীন। হুমায়ুন সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই পূর্বদিকে আফগান দলপতিরা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করে। আবার পশ্চিমে মালব ও গুজরাটের বাহাদুর শাহ তাঁর বিরোধিতায় এগিয়ে আসেন। এ সময় শের খান নামে একজন খুবই সাহসী আফগান দলনেতা নিজের শক্তি বাড়িয়ে তোলেন। ১৫৩২ সালে শের খান চুনার অধিকার করেন। শের খান ছিলেন বিহার ও বাংলার আফগান সামন্ত-রাজাদের একজন।

হুমায়ুন দিল্লীর মসনদ পেয়েছিলেন। তাঁর অন্য তিন ভাই পেয়েছিলেন পাঞ্জাব, কাবুল ও কান্দাহার। বাবর মারা যাওয়ার পর হুমায়ুন গোড়ার দিকে গুজরাট, রাজপুতনার কিছু অংশ ও বিহার জয় করেছিলেন। কিন্তু মোঘলদের মধ্যে

একতা গড়ে তুলতে পারেন নি তিনি। ফলে ১৫৪০ সালে বক্সারের কাছে চৌসায় শের খানের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি সিন্ধুদেশে পালিয়ে যান।

শের খান গৌড় জয় করেন ১৫৩৮ সালে। এই জয়ের ফলে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান ঘটে। এরপর সারা বাংলা আফগানদের অধিকারে চলে যায়। বাংলার মোঘল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলি তাঁর কাছে পরাজিত হন। বাংলা জয়ের পরই শের খান দু'বছরের মধ্যে মোঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি শের শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। বাংলায় আফগান শাসনের সূচনা ঘটে ১৫৩৮ সালে। এ শাসন চলে ৩৮ বছর ধরে।

বাংলা অধিকার করার পর শের শাহ তাঁর একজন সহযোগী খিজির খানকে বাংলার শাসন পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু শের শাহ বাংলা ছেড়ে যাবার পরই খিজির খান নানা টালবাহানা শুরু করেন। তখন শের শাহ আবার গৌড়ে এসে খিজির খানকে সরিয়ে দেন ও বন্দী করেন। তারপর তিনি বাংলার শাসন পরিচালনার জন্য কয়েকটি কাজ করেন। হোসেন শাহী আমলে বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের ও হাজীপুর সহ বিরাট এলাকা বাংলার অধীনে ছিল। শের শাহ বিহারের এসব এলাকা আলাদা করে দেন। তেলিয়াগড় হলো বাংলার পশ্চিম সীমানা। এরপর তিনি বাংলাকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করেন। প্রত্যেক এলাকার জন্য একজন করে শাসক নিয়োগ করেন। তাঁরা সবাই সরাসরি দিল্লীর সুলতানের নিকট দায়ী থাকতেন।

শের শাহ ছিলেন উদার ও নিপুণ শাসক। তাঁর সময়ে সারা দেশে শান্তি ও সুশাসন ছিলো। তিনি যোগাযোগের সুবিধার জন্য ঢাকার কাছে সোনার গাঁ থেকে সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি বড় রাজপথ নির্মাণ করেন। এই রাজপথটিই এখনো গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। শের শাহের আমলে পাঁচ বছর এবং তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ শূর-এর আমলে আট বছর বাংলা সরাসরি দিল্লীর অধীনে ছিল। ১৫৪৫ সালে শের শাহ মারা যাওয়ার পর ইসলাম শাহ শূর দিল্লীর মসনদে বসেন।

ইসলাম শাহ শূর তাঁর পিতার শাসন-রীতির কিছু বদল করেন। তিনি সারা বাংলার জন্য আবার আগের মতো একজন শাসক নিয়োগ করেন। এর ফলে বাংলার শাসক আবার তাঁর শক্তি বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান। ইসলাম শাহ শূর ১৫৫৩ সালের ৩০ অক্টোবর মারা যান। তখন বাংলার আফগান শাসক শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি দিল্লীর আফগান শাসক আদিল শাহ শূরের সেনাপতি হিমুর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। আদিল শাহ এবার শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনভার দিয়ে পাঠান। কিন্তু

শামসুদ্দীনের পুত্র খিজির খান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করেন। এরপর শাহবাজ খানের সাথে তাঁর লড়াই হয়। শাহবাজ খান পরাজিত হন। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ ধীরে ধীরে সারা বাংলা তাঁর অধীনে নিয়ে আসেন। তিনি মোঘল সেনাপতি খান জাহানের সাথে যোগাযোগ করে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ মারা যান ১৫৬০ সালে। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর সময় বাংলায় আর কোনো বড় ধরনের লড়াই হয় নি। বাহাদুর শাহের পর তাঁর ভাই জালাল শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল শাহ বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন নামে একজন আফগান সেনাপতি তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন। তাপর গিয়াসুদ্দীন নিজেই সিংহাসনে বসেন। এরপর ১৫৬৪ সালে সর্দার তাজ খানের হাতে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন। তাজ খানই বাংলায় কররানী বংশের শাসন শুরু করেন।

সর্দার তাজ খান সিংহাসনে বসার পর এক বছর বেঁচে ছিলেন। এবার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই সুলায়মান কররানী। তিনি আট বছর বাংলা শাসন করেন। সুলায়মান কররানী তাঁর শাসনকালে রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেন। তাঁর সময়ে দেশে মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। তিনি মোঘল সম্রাট আকবরের অধীনতা মেনে নেন। তবে আসলে স্বাধীনভাবেই তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। ১৫৭২ সালে তিনি মারা যান। এবার সিংহাসনে বসেন তাঁর বড় ছেলে বায়েজিদ। বায়েজিদ কারো সাথে ভালো আচরণ করতেন না। ফলে আফগান সর্দাররা তাঁর উপর বিরক্ত হন। তাঁরা বায়েজিদকে মেরে ফেলেন। তারপর সুলায়মানের আরেক ছেলে দাউদ খানকে সিংহাসনে বসান। দাউদ খানের সময়েই বাংলাদেশ মোঘল সম্রাট আকবরের অধীনে চলে যায়। এবার শুরু হয় মোঘল শাসন।

মোঘল আমল

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই রাজমহলের কাছে দাউদ খান মোঘল বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তখন থেকেই বাংলাদেশে মোঘল শাসনের সূচনা ঘটে। তবে বাংলার শাসন তখনো পুরোপুরি মোঘলদের হাতে যায় নি। এ-সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশই কেবল মোঘলদের সরাসরি অধিকারে ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলায় কয়েকজন প্রভাবশালী জমিদার মোঘল শাসনের বিরোধিতা করতে শুরু করেন। ইতিহাসে এঁরা বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে ঈসা খান ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী। ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরের বেশ কিছু এলাকা জুড়ে ছিল তাঁর রাজ্য। ঢাকার কাছে সোনার গাঁ ছিল তাঁর রাজধানী। দুলাই

নদী ও লক্ষ্যা নদী যেখানে মিশেছিল সেখানে ছিল তাঁর দুর্গ। দুর্গটির নাম খিজিরপুর দুর্গ। ঈসা খান খুব সাহসী ছিলেন। তিনি সুশাসকও ছিলেন। তাঁর বেশ বড় একটি সেনাবাহিনী ছিল। দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সময় তাঁর সেনাপতি মান সিংহ বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলায় আসেন। ঈসা খান ও মান সিংহের যুদ্ধ ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা। মান সিংহ বাংলার অনেক জায়গা দখল করে নেন। পরে ঈসা খান মোঘল বাদশাহের অধীনতা মেনে নেন। তবে তিনি আসলে স্বাধীনভাবেই সারাজীবন শাসন পরিচালনা করেন। ঈসা খান ছাড়াও বাংলার অন্য জমিদাররা মোঘল বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এ সময় মোঘল অধিকার বাংলায় তেমন ভালোভাবে কায়েম হয় নি। বাদশা আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তাঁর সময়ও বারভূঁইয়াদের সাথে মোঘল বাহিনীর অনেক যুদ্ধ হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন ইসলাম খান চিশতীকে। এ সময় ঈসা খানের পুত্র মুসা খান ছিলেন সোনার গাঁর শাসক। মোঘল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসার পথে ইসলাম খান বারভূঁইয়াদের প্রবল বাধার মুখোমুখি হন। ফলে বাংলার নানা জায়গায় অনেকদিন ধরে যুদ্ধ চলে। অবশেষে ইসলাম খান বাংলা মোঘলদের অধিকারে নিয়ে আসেন। তাঁর রাজধানী ছিল রাজমহলে।

মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সময় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন। তিনি বিশ বছর ধরে (১৬৩৯–১৬৬০) বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। সম্রাট শাহজাহান মারা যাওয়ার পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব এ বিবাদে জয়ী হন এবং সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন মীর জুমলা (১৬৬০–১৬৬৩)। তিনি মাত্র কয়েক বছর বেঁচেছিলেন। এ সময় তাঁকে অনেকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। তবে শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনায় সুবিধা হবে মনে করে তিনি রাজধানী নিয়ে আসেন রাজমহল থেকে ঢাকায়।

মীর জুমলার পর বাংলার সুবাদারের পদ লাভ করেন শায়েস্তা খান। তিনি প্রায় বাইশ বছর বাংলার সুবাদার হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন (১৬৬৪–১৬৮৮)। তাঁর আমলে বাংলায় মোঘল শাসনের ভিত পাকা হয়। ১৬৬৬ সালে তিনি চট্টগ্রাম দখল করেন। শায়েস্তা খান সেনাপতি ও শাসক হিসেবে খুবই যোগ্য ছিলেন। সে সময়ে বাংলার নদীপথে পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুরা নিয়মিত হামলা চালাতো। তারা নদীতীরের গ্রামগুলো লুঠ করতো, অনেক মানুষজন ধরে নিয়ে যেতো। পরে এদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো। শায়েস্তা খান এদের দমন করার জন্য মোঘল নৌ–বাহিনীর শক্তি বাড়িয়ে তোলেন। ফলে পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের হামলা কমে যায়। বাংলার মানুষ শান্তিতে বসবাস করার

সুযোগ পায়। শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় সুশাসন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যায়। জিনিসপত্রের দামও ছিল খুব কম।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় শেষদিকে তাঁর পৌত্র আযিমুশ্‌শান বাংলার সুবাদার ছিলেন। সে-সময় বাংলার দেওয়ান পদ লাভ করেন মুর্শিদকুলি খান। আযিমুশ্‌শান বিলাসিতায় দিন কাটাতেন। মুর্শিদকুলি খান তা পছন্দ করতেন না। এর ফলে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। তখন মুর্শিদকুলি খান সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তাঁর দেওয়ানী দফতর মখসুদাবাদে নিয়ে যান। এই মখসুদাবাদই পরে মুর্শিদাবাদ নামে বাংলার রাজধানী হয়। মুর্শিদকুলি খান ১৭২৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

মুর্শিদকুলি খানের জামাতা সুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান বাংলার শাসনভার লাভ করেন ১৭২৭ সালে। তিনি বারো বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার শাসনভার হাতে পান। তিনি তেমন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দী খান তাঁকে পরাজিত করে ১৭৪০ সালে বাংলার শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নেন। তিনি নামেমাত্র মোঘল সম্রাটের অধীন ছিলেন। আসলে প্রায় স্বাধীনভাবেই তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর সময়ে মারাঠা বাহিনী কয়েকবার বাংলায় হামলা চালায়। বর্গীর হামলা নামে তা ইতিহাসে পরিচিত। আলীবর্দী খান এ হামলার অবসান ঘটানোর জন্য এগিয়ে যান। তিনি মারা যান ১৭৫৬ সালে। আলীবর্দীর কোনো ছেলে ছিল না। তাঁর মেয়ে আমেনা বেগমের ছেলে মীর্জা মুহম্মদ সিরাজুদ্দৌলা নাম নিয়ে এবার বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়েই বাংলায় ইংরেজ অধিকার কায়েম হয়।

বাংলায় ইংরেজদের আগমন

সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল তারিখে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনভার হাতে নেন। নবাব আলীবর্দী খান ইন্‌তেকাল করেন ৮০ বছর বয়সে, ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল। নবাব আলীবর্দীর তিন মেয়ের মধ্যে সিরাজের মাতা আমেনা বেগম ছিলেন সবার ছোট। সিরাজকে আলীবর্দী খান খুবই ভালোবাসতেন। মারা যাওয়ার আগে আলীবর্দী সিরাজুদ্দৌলাকে ডেকে কিছু উপদেশ দেন। সে সময় তিনি বলেন, "তুমি দুশমনদের দমন করবে এবং বন্ধুদের রাজ্যের বড় পদে বসাবে। তোমার সকল শক্তি দিয়ে প্রজাদের উপকার করবে। ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবে।" মাতামহ আলীবর্দীর উপদেশ সিরাজুদ্দৌলা পালন করতে চেয়েছিলেন। আর সে কারণেই মাত্র এক বছর দু'মাস রাজত্ব করার পর নিহত হন তিনি।

সিরাজুদ্দৌলার এই এক বছরের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের বিশেষ এক সময়। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে এ সময়েই। সিরাজ সিংহাসনে বসার আগে থেকেই বাংলার নবাবী নিয়ে কলহ চলে আসছিল। বিশেষত আলীবর্দীর বড় মেয়ে ঘসেটি বেগম এবং দ্বিতীয়া কন্যা শাহ বেগমের পুত্র শওকত জঙ্গ সিরাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। সিংহাসনের অধিকার নিয়ে পারিবারিক কলহ কোনো নতুন ঘটনা নয়। সিরাজ তা জানতেন। তাই সিংহাসনে বসার পর থেকেই তিনি তাঁর দুশমনদের দমন করার ব্যবস্থা নিতে থাকেন। ঘসেটি বেগম তখন মুর্শিদাবাদের কাছে মতিঝিল প্রাসাদে থাকতেন। সিরাজুদ্দৌলার সেনাবাহিনী প্রাসাদটি দখল করে নেয়। ঘসেটি বেগমকে বন্দী করা হয়। তাঁর টাকা-পয়সা ও ধনরত্ন আটক করা হয়। এর পরিমাণ ছিল নগদ চার কোটি টাকা এবং ৪০ লাখ মোহর। আর ছিল খুব দামি বাসন-কোসন, যার দাম এক কোটি টাকার মতো। এরপর তিনি শওকতজঙ্গকে দমন করেন। কিন্তু তিনি তখনো জানতেন না তাঁর আসল দুশমন কে। ইনি মীরজাফর।

মীরজাফর আলী খান এসেছিলেন ইরান থেকে। সাধারণ একজন সৈনিক ছিলেন তিনি। নবাব আলীবর্দী তাঁর বোন সাহ্ খানমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। নবাব তাঁকে এর পর উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। খুব কম সময়ের ভেতরে মীরজাফর সেনাবাহিনীর বক্সীর পদ লাভ করেন। সৈনিক হিসেবে তাঁর সুনাম তেমন ছিল না। তবে তিনি খুব চতুর ছিলেন। তোষামোদ করতেও জানতেন বেশ ভালো। বর্গীর হামলার সময় নবাব আলীবর্দীর সাথে থেকে তিনি নবাবের প্রিয় হয়েছিলেন। আলীবর্দী খান মারা যাওয়ার পর সিরাজুদ্দৌলা সিংহাসন লাভ করায় তিনি খুব খুশী হন নি। মীর জাফর আলী খান মনে করতেন সিংহাসনের উপর তাঁরও দাবি আছে।

এদিকে বাংলার আকাশে তখন মেঘ ঘনিয়ে আসছিল অন্যদিক থেকে। এ মেঘ ছিল ইংরেজ বণিকদের অশুভ পাঁয়তারা। ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি সনদ দেন। এই সনদে কোম্পানীকে উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বদিকের সব দেশে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দেওয়া হয়। ১৬০৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত ক্যাপটেন উইলিয়ম হকিন্স মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তিনি কোম্পানির জন্য তেমন কিছু সুবিধা আদায় করতে পারেন নি। কারণ এ সময় ভারতে পর্তুগিজ বণিকদের বেশ প্রভাব ছিল। তারা ইংরেজদের বিরোধিতা করে। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ বণিকদের সুরাট বন্দরে বাণিজ্যকুঠি তৈরির অনুমতি দেন। ১৬১৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের

দরবারে আসেন। তিনি মোঘল বাদশাহের কাছ থেকে ইংরেজ বণিকদের জন্য আরো বেশ কিছু সুবিধা আদায় করেন। ১৬৩৯ সালের শেষ দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয়নগরের সামন্তরাজার কাছ থেকে মাদ্রাজে একটি বন্দর তৈরির অনুমতি লাভ করে।

সেকালে ভারতে ব্যবসা করার জন্য বিদেশী বণিকদের চার ধরনের অনুমতি দেওয়া হতো। এগুলো হচ্ছে ফরমান, হুসব-উল-হুকুম, নিশান ও পরোয়ানা। ফরমান দেওয়ার অধিকার ছিল বাদশাহের। প্রধানমন্ত্রী দিতেন হুস্‌ব-উল-হুকুম। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা দিতেন নিশান আর অন্য রাজকর্মচারীরা দিতে পারতেন পরোয়ানা। ১৬৫০ সালে মোঘল সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে ফরমান আদায় করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৫১ সালে হুগলীতে ইংরেজ বণিকরা প্রথম বাণিজ্যকুঠি তৈরি করে। এরপর ইংরেজরা উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হরিহরপুরে এবং বাংলাদেশের মেদিনীপুরের কাছে পিপলিতে কয়েকটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে।

১৬৬১ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথরিনকে বিয়ে করেন। পর্তুগালের রাজা তাঁকে বোম্বাই দ্বীপটি যৌতুক হিসেবে উপহার দেন। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬৮ সালে দ্বীপটি বছরে দশ পাউন্ড খাজনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দেন। এদিকে বাদশাহ শাহজাহানের ফরমান দেখিয়ে ইংরেজ বণিকরা বাংলার শাসনকর্তা শাহ সুজার কাছ থেকে ১৬৫৬ সালে একটি নিশান আদায় করে। এই নিশানে তাদের বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। এর পরের কয়েক বছরে তারা নিশানটি কাজে লাগিয়ে মোঘল রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে দুটি পরোয়ানা আদায় করে।

১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। মীরজুমলা বাংলার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। তাঁর সাথে ইংরেজদের মোটামুটি ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৬৮০ সালে ইংরেজ বণিকরা বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে নতুন একটি ফরমান আদায় করে। এইসব ফরমান ও নিশানের জোরে ইংরেজ বণিকরা বাংলায় ভালোভাবে ব্যবসা করতে থাকে। ১৬৮০ সালে তারা মোট এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের মাল রপ্তানি করে। এর পরের বছরে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় দু'লাখ ত্রিশ হাজার পাউন্ড। ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা হওয়ায় ইংরেজদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা বাংলাদেশে নিজেদের অধিকার কায়েম করার কথাও ভাবতে থাকে। বিশেষত তখন ভারতে মোঘল শাসন অনেকটা দুর্বল হয়ে এসেছিল। দিল্লীর প্রভাবও আসছিল কমে। এ অবস্থার সুযোগ নেবার কথা ইংরেজরা গভীরভাবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

বাংলায় বাণিজ্য করার সাথে সাথে ইংরেজরা এখানে দুর্গ তৈরির কথাটিও ভাবতে শুরু করেছিল। তারা মনে করতো কোনো রকম অসুবিধা ছাড়া বাণিজ্য চালানোর জন্য শক্তিশালী দুর্গ তৈরি করা প্রয়োজন। তাছাড়া সেনাবাহিনীও গঠন করা দরকার। প্রথম থেকেই বাংলার বাণিজ্যকুঠি পরিচালনা করত মাদ্রাজ কাউন্সিল। ১৬৮২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দায়িত্ব পায়। উইলিয়াম হেজেস ছিলেন বাণিজ্যকুঠির প্রথম এজেন্ট ও গভর্নর। বাংলায় সামরিক শক্তি বাড়ানোর কাজটি তিনিই শুরু করেন। নিজেদের সামরিক শক্তির ব্যাপারে ইংরেজদের ধারণা ছিল বেশ উঁচু। এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব বাংলাদেশ ও বিহার থেকে বিদেশে শোরা রপ্তানি বন্ধ করে দেন। এতে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসা কমে যায়। তখন বিলেতে কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড ভারতে সামরিক অভিযান চালানোর কথা ভাবতে শুরু করে। রাজা দ্বিতীয় জেমস-এর সময় ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নিকলসন ১২ খানা যুদ্ধজাহাজ, ২০০ কামান এবং ৬০০ সৈন্য নিয়ে ভারত অভিমুখে রওয়ানা হন। ঠিক করা হয় যে, মাদ্রাজ থেকে আরো ৪০০ সৈন্য তাঁর সাথে যোগদান করবে। নিকলসনের উপর চট্টগ্রাম বন্দর দখল করার ভার দেওয়া হয়। ইংরেজদের ইচ্ছে ছিল চট্টগ্রাম দখল করার পর বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় আক্রমণ চালানো। তাদের ধারণা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর ইংরেজদের দখলে এলে তারা বাণিজ্য করার সুবিধা পাবে অনেক বেশি।

এদিকে উইলিয়াম হেজেস-এর বদলে জব চার্নক হুগলীর এজেন্ট ও গভর্নরের পদ লাভ করেন। ১৬৮৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে হুগলীতে ইংরেজ সৈন্য ও মোঘলদের মধ্যে বিরোধ বাধে। যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দেগে ইংরেজরা মোঘলদের বেশ ক্ষতি করে। তবুও মোঘল আক্রমণের ভয়ে জর্ব চার্নক হুগলী ছেড়ে চলে যান ২৫ মাইল দূরে সুতানুটি গ্রামে। এখান থেকে তিনি সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছে আপোস-রফার অনুরোধ জানান। শায়েস্তা খান তখন ইংরেজদের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দেন। এরপর জব চার্নক ৬ মাস ধরে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে মোঘলবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। ১৬৮৭ সালের মে মাসে মোঘল বাহিনী ও ইংরেজদের যুদ্ধ বন্ধ হয়। শায়েস্তা খান আগস্ট মাসে ইংরেজদের আবার বাংলাদেশে বাণিজ্যকুঠি তৈরির অনুমতি দেন। সেপ্টেম্বর মাসে জব চার্নক সুতানুটি ফিরে আসেন। কিন্তু বোম্বাইয়ে ইংরেজ ও মোঘলদের মধ্যে বিরোধ শুরু হলে ইংরেজরা সুতানুটি ছেড়ে চলে যায়। ১৬৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তারা মাদ্রাজে ফিরে যায়। এছাড়া তখন তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। মোঘল বাহিনীর মোকাবেলা করে ভারতে টিকে থাকা যে সম্ভব নয় সে কথা তারা

বুঝতে পারে। এর পর ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট ইংরেজরা সুতানুটিতে ফিরে আসে। সেদিনটি থেকেই কলকাতা শহর গড়ে উঠতে শুরু করে। অবশেষে ১৬৯৬ সালে তারা কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে। তখন ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় উইলিয়ম। তাঁর নামে দুর্গের নাম রাখা হলো ফোর্ট উইলিয়ম। দুর্গ নির্মাণের পর তারা ভারতীয়দের নিয়ে সেনাবাহিনীও গড়ে তোলে এবং তাদের ইউরোপীয় কায়দায় যুদ্ধ শেখাতে থাকে।

১৬৯৭ সালে আওরঙ্গজেব তাঁর পৌত্র আজিম-উস-শানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান। তাঁকে নানা উপহার ও নগদ টাকা দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর-এই তিনখানা গ্রাম কেনার অনুমতি আদায় করে নেয়। ১৬৯৮ সালে গ্রাম তিনটি কেনা হয় ১২০০ টাকা দিয়ে জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে। ১৭০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ানের পদ লাভ করেন। এ সময় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে তখন ইউরোপীয় জলদস্যুরা খুব তৎপর ছিল। এ কারণে আওরঙ্গজেব ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন। মুর্শিদকুলি খান ১৭০৪ সালে বাদশাহের আদেশে ইংরেজদের পাটনা, কাশিমবাজার ও রাজমহলের কুঠি দখল করে নেন। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পর ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গকে আরও শক্ত ঘাঁটি করে তোলে। তারপর ধীরে ধীরে মোঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শক্তি বাড়াতে থাকে। ১৭১৭ সালে বাদশাহ ফররুখ শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানি একখানা ফরমান আদায় করে। এই ফরমান বলে কোম্পানি অবাধ ব্যবসার সুযোগ লাভ করে। তারা কলকাতার কাছে ৩৮ খানা গ্রাম কেনার অনুমতিও পায়। ধীরে ধীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অধিকার বাড়াতে থাকে।

১৭৫৬ সালে সিরাজুদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসার পর ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। নবাব মনে করতেন, ইংরেজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা তাদেরকে দেয়া সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করছে। নবাব আরও মনে করতেন যে, কোম্পানির লোকেরা তাঁকে নবাব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যও গোপনে কাজ করছে। ফলে সে বছর মে মাসে সিরাজুদ্দৌলার বাহিনী কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করে। ইংরেজরা ঘেরাও হয়ে যায়। কুঠির কর্মকর্তা উইলিয়াম ওয়াটস নবাবের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইংরেজরা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কাজ না করে নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে শুরু করে। ফলে ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নবাব নিজে কলকাতায় ইংরেজদের দমনের জন্য এক অভিযান

পরিচালনা করেন। কোম্পানির সৈন্যরা যুদ্ধ করে, কিন্তু হেরে যায়। অতঃপর পরাজিত ইংরেজ পক্ষ নবাবের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এতে ৭টি শর্ত ছিল। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

পলাশীর পটভূমি

৯ ফেব্রুয়ারির চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা আবার বাংলায় ব্যবসা শুরু করার সুযোগ লাভ করে। ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ খুবই চতুর লোক ছিলেন। তিনি নবাবের সাথে চুক্তি করেছিলেন কোম্পানির অধিকার গুছিয়ে নেবার জন্য। তাঁর মনে আশা ছিল সিরাজুদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজেদের অনুগত কোনো লোককে সিংহাসনে বসানো। ইংরেজরা খুব তাড়াতাড়ি সামরিক শক্তি বাড়াতে শুরু করে। অন্যদিকে নবাবের দরবারের অনেকের সাথে তারা গোপনে যোগাযোগ করতে থাকে। মীর জাফর নবাব হওয়ার আশা পোষণ করতেন। অতএব ইংরেজদের সাথে তাঁর গোপন সমঝোতা হতে দেরী হলো না।

এদিকে সে সময় ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে লড়াই চলছিল। বাংলাদেশেও এ লড়াই ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিশেষত ইংরেজরা বাংলায় ফরাসিদের প্রভাব শেষ করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ফরাসিদের বাণিজ্যকুঠি ছিল চন্দননগরে। নবাবের সাথে ইংরেজদের সমঝোতা হওয়ায় তারা বুঝতে পারে যে, এবার ইংরেজরা সুযোগ বুঝে তাদের উপর আঘাত হানবে। তাই তারা ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চন্দননগর থেকে তিনজন ফরাসি প্রতিনিধি ফোর্ট উইলিয়মের বিশেষ একটি সভায় যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় যে, ইউরোপে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চললেও বাংলাদেশে তারা একে অপরকে আক্রমণ করবে না। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি চার্লস ওয়াটসন এই চুক্তি অনুমোদন করতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, পণ্ডিচেরীর অনুমোদন ছাড়া চন্দননগরের ফরাসিরা কোনো চুক্তি করতে পারবে না।

আসলে ওয়াটসন তখন চন্দননগর দখল করার মতলব আঁটছিলেন। ৪ মার্চ বোম্বাই থেকে একদল নতুন সৈন্য কলকাতা এসে পৌছে। ১৩ মার্চ রবার্ট ক্লাইভ ফরাসিদের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে চন্দননগর দুর্গ ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বলেন। ফরাসিরা এতে রাজী না হওয়ায় সে রাতেই উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পিয়ের রেনল ছিলেন তখন চন্দননগরে ফরাসিদের প্রধান। মাত্র ৭৯৪ জন লোক নিয়ে তিনি ইংরেজদের বাধা দেন। ২৩ মার্চ দুর্গের পতন ঘটে। ইংরেজ ও

ফরাসিদের লড়াইয়ের সময় সিরাজুদ্দৌলা বাধা দেন নি। কিন্তু ইংরেজদের এ কাজটি তিনি ভালো চোখেও দেখেন নি। কয়েকবার তিনি ফরাসিদের উপর আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে ইংরেজদের নিষেধ করেছিলেন। তাঁর সেনাপতিদের কয়েকজন এ লড়াইয়ে বাধা দেবার জন্য এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ খুবই চতুরভাবে নবাবকে সামাল দেন। বিশেষত প্রায় একই সময়ে আহমদ শাহ আবদালীর আফগান বাহিনী বাংলার দিকেও এগিয়ে আসছিল। মারাঠাদের হামলার কথা নবাবের মনে ছিল। তাই আফগানদের হামলার বিষয়টিই তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছিল। এ সময় ইংরেজদের সাথে আবার বিবাদ বাধাতে তিনি চান নি। তবে ফরাসিদের নিরাপদে বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার ব্যাপারে তিনি সহায়তা করেন। এতে ইংরেজরা অখুশী হয়।

এদিকে সিরাজুদ্দৌলার সাথে চুক্তি করলেও ইংরেজরা নানাভাবে নবাবকে অসুবিধায় ফেলতে থাকে। তাদের মনে ভয় ছিল সময় ও সুযোগ পেলেই সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের বিরোধিতা করবেন। তাই তারা বাংলার মসনদ থেকে সিরাজুদ্দৌলাকে সরিয়ে দেবার কাজটি জোরেশোরে শুরু করে। ১ মে তারিখে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা এ বিষয়টির প্রতি সমর্থন জানায়। ইংরেজরা ঠিক করে যে, সিরাজুদ্দৌলাকে সরিয়ে অন্য কাউকে তারা সিংহাসনে বসাবে। মীরজাফরকে নতুন নবাব মনোনীত করা হয়। অন্যদিকে তারা নবাবের বেশ কয়েকজন সেনাপতি ও সহযোগীর সাথে গোপনে যোগাযোগ করতে থাকে। এদের অনেকেই নানা কারণে নবাবকে পছন্দ করতো না। অন্যরা লোভে ও ভয়ে ইংরেজদের সমর্থন দেয়। ইংরেজদের সব যোগাযোগই চলছিল খুব গোপনে। কিছু কিছু সংবাদ নবাবের কানেও আসছিল। কিন্তু সঠিক সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন না। তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভ বার বার তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর সাথে ইংরেজদের ভালো সম্পর্কের ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ জানাচ্ছিলেন। ইংরেজদের শঠতা বুঝতে না পেরে নবাব দেশের কয়েকটি জায়গায় তাঁর যে বাহিনী মোতায়েন ছিল তাদের মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনেন। এ সময় মে মাসের ৩০ তারিখে মীরজাফরও মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

সিরাজুদ্দৌলা মীরজাফরকে সন্দেহ করতেন। তাই তিনি সেনাবাহিনীর বক্সীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে খাজা আবদুল হাদিকে নিয়োগ করেন। কিন্তু মীরজাফর পবিত্র কোরান হাতে নিয়ে শপথ করে বলেন যে, তিনি নবাবের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছেন না। তখন সিরাজুদ্দৌলা আবার মীরজাফরকে বক্সী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদে বহাল করেন। এ সময় খাজা আবদুল হাদি এবং মীরমদন নবাবকে বলেন যে, মীরজাফরকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু মীরজাফরের

চতুর অভিনয়ে নবাবের মন গলে যায়। যে সময়ে তাঁর কঠোর হওয়ার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সে সময়েই তিনি কঠোর হতে পারলেন না।

এদিকে ক্লাইভ খুবই সুকৌশলে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। সব যোগাযোগ ঠিক হয়ে যাবার পর তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে দোষারোপ করলেন যে, নবাব ৯ ফেব্রুয়ারির চুক্তি মানছেন না। তাঁর অভিযোগ ছিল নবাব ফরাসিদের তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। অতএব ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। অন্যদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের একটি গোপন চুক্তি হয়। এতে ১৫টি শর্ত ছিল। বাংলার সিংহাসনে বসার লোভে মীরজাফর ইংরেজদের সব শর্ত মেনে নেন। আর এই চুক্তির শর্তগুলি ছিল পুরোপুরি ইংরেজদের অনুকূলে। এই চুক্তির ফলেই বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। বাংলার তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে এটি ছিল খুবই বড় একটি ঘটনা। পরে সেটিই প্রমাণিত হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধ

মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সমঝোতা হয়ে যাবার পর রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল ২৫০ জন ইউরোপীয় সৈন্য, ৫০ জন নাবিকসহ ১০০ জন আধা-ইউরোপীয় সৈন্য, আটটি কামান, ১৫০ জন গোলন্দাজ এবং ২১০০ জন সিপাহী। ১৩ জুন ক্লাইভ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এর আগের দিন ক্লাইভ হুগলীর ফৌজদার শেখ আমীরউল্লাহ্‌কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে হুমকির সুর ছিল। শেখ আমীরউল্লাহ্ কিছুটা বুঝতে পারেন যে, রবার্ট ক্লাইভের সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ গমনের ব্যাপারটি সাধারণ কোনো বিষয় নয়। চিঠিটি তিনি সেদিনই নবাবকে পাঠিয়ে দেন। অপরদিকে রবার্ট ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদের দিকে আর এগিয়ে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ক্লাইভ ফৌজদারকে জানালেন যে, ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজকে যদি বাধা দেওয়া হয় অথবা তাদের জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার কাজে অসুবিধা করা হয়, তাহলে হুগলী শহর ধ্বংস করে দেওয়া হবে। ক্লাইভের হুমকিতে শেখ আমীরউল্লাহ ভয় পেলেন। ভয় পাওয়ার কারণও ছিল। আসলে হুগলী শহরে নবাবের ঘাঁটি তেমন শক্ত ছিল না। সেখানে সৈন্যও ছিল না তেমন বেশি। বিশেষত ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজের গোলাবর্ষণের সামনে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন অসহায়। তাছাড়া কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে নবাবের তেমন কোনো দুর্গও ছিল না। ইংরেজ কোম্পানি নবাবের এসব দুর্বলতার বিষয় হিসাব করেই সিরাজুদ্দৌলার উপর আঘাত হানার নক্‌শা তৈরি করেছিল।

বিনা বাধায় হুগলী পেরিয়ে রবার্ট ক্লাইভ ১৭ জুন পাটলি পৌছেন। ১৮ জুন পাটলি থেকে তিনি মীরজাফরকে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি মীরজাফরকে তাঁর অভিযানের বিবরণ জানিয়ে দেন। ক্লাইভ তাঁর চিঠিতে আরও জানান যে, এখন থেকে প্রতিদিন তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা দরকার। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট তাঁর বাহিনী নিয়ে ১৮ জুন কাটোয়া পৌছেন। ১৯ তারিখ তিনি কাটোয়া দুর্গ অবরোধ করেন। কাটোয়ার দুর্গটি ছিল ভাগীরথী নদীর খুব কাছে। এর পাশেই ছিল মুর্শিদাবাদ যাওয়ার রাজপথ। সামরিক দিক থেকে দুর্গটির খুবই গুরুত্ব ছিল। কিন্তু মাটির এ দুর্গটিতে নবাবের সৈন্য খুব বেশি ছিল না। দুর্গের অধিনায়ক ইংরেজদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ বাহিনীর সাথে লড়াই না করেই নবাবের সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। ফলে তেমন কোনো বাধা ছাড়াই ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট দুর্গটি দখল করে নেন। ১৯ তারিখ রাতে ক্লাইভও তাঁর বাহিনী নিয়ে কাটোয়া পৌছেন। সেখান থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফরকে চিঠি পাঠান। আবার ঐ দিনই তিনি মীরজাফরের একটি চিঠি পান। চিঠিতে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে নবাবের সেনাবাহিনীর কে কোথায় কিভাবে থাকবেন তার বিবরণ জানান। মীরজাফরের চিঠিতে সিরাজুদ্দৌলার প্রতিটি কাজের খবর থাকতো। এতে ক্লাইভের বিশেষ সুবিধা হয়। তাছাড়া জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ সহ অন্যদের কাছ থেকেও ক্লাইভ নিয়মিত খবর নিতেন। মীরজাফরের উপরই কেবল ভরসা করে তিনি নবাবের সাথে লড়াইয়ে নামার ঝুঁকি নেন নি। ইংরেজ সৈন্যদের আধুনিক রণকৌশলে কুশলী করে তোলার যাবতীয় আয়োজনও তিনি করেছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ জানতেন — নবাবের সাথে লড়াইয়ে যদি ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়, তাহলে বাংলা থেকে তাদের চিরবিদায় নিতে হবে। তাই প্রথমে তিনি ঠিক করেন যে, বর্ষাকাল শেষ না হলে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী ভাগীরথী পার হবে না। ততদিন ইংরেজ বাহিনী কাটোয়াতেই থাকবে।

২১ জুন তারিখে ক্লাইভ কাটোয়া দুর্গে ইংরেজদের সমর-পরিষদের এক বৈঠক ডাকেন। পরিষদের ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জন মত দেন যে, ক্লাইভের মতানুযায়ী বর্ষাকাল কাটোয়া দুর্গেই কাটানো উচিত। অন্যদিকে আয়ার কুট ও অপর ৬ জন দেরি না করে তখনই যুদ্ধ করার কথা বলেন। আয়ার কুট বললেন যে, কাটোয়ায় বসে থাকলে ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল কমে যাবে। তখন তারা নবাবের বিরাট বাহিনীর মুখোমুখি হতে ভয় পাবে। ক্লাইভ নিজে তখনই যুদ্ধ না করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বৈঠক শেষ হবার এক ঘন্টা পর তিনি তাঁর মত বদল করেন। সেনাপতি আয়ার কুটের সাথে একমত হয়ে তিনিও বললেন যে, লড়াই তাড়াতাড়িই করতে হবে। অতএব সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে পলাশীর দিকে

এগিয়ে যেতে থাকলেন। ২২ জুন সকালেই ইংরেজ বাহিনী রওয়ানা হয়। তারা অগ্রদ্বীপের কাছে ভাগীরথী নদী পার হয়ে যায়। সেদিন রোদ যেমন জোরালো ছিল, তেমনি মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হচ্ছিল। ইংরেজ বাহিনী কোথাও না থেমে রাত বারোটায় পলাশী প্রান্তরে এসে পৌছায়।

রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর আমবাগানের ভেতরে লাখবাগ নামে একটি জায়গায় তাঁর সৈন্যদের শিবির সাজান। জায়গাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০০ গজ এবং প্রস্থ ৩০০ গজ। এর চারদিকে ছিল মাটির প্রাচীর। আমবাগানের ঘন আমগাছ এবং মাটির প্রাচীর ইংরেজ সৈন্যদের জন্য বেশ সুবিধাজনক হয়। তাছাড়া লাখবাগের উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৫০ গজ দূর দিয়ে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। এদিক থেকে নবাবের সৈন্যদের আক্রমণের সুযোগ ছিল না। আমবাগানের ২০০ গজ উত্তরে 'পলাশী হাউস' নামে একটি বাড়ি ছিল। 'পলাশী হাউস' ছিল ইটের তৈরি। নবাব শিকারে এলে 'পলাশী হাউসে' থাকতেন। এর চারদিকে শক্ত দেয়ালও ছিল। রবার্ট ক্লাইভ বুঝতে পারলেন, সামরিক দিক থেকে 'পলাশী হাউসে' ঘাঁটি করে বসা খুবই সুবিধাজনক হবে। এর ছাদ থেকে চারদিকে নজর রাখার কাজটিও হবে ভালোভাবে। ক্লাইভ তাই দেরী না করে 'পলাশী হাউস' দখল করে নিলেন।

'পলাশী হাউস' থেকে ৪০০ গজ উত্তরে ভাগীরথী নদীর খুব কাছেই ছিল বেশ বড় একটি দীঘি। এর ১০০ গজ উত্তরে ছিল একটি ছোট পুকুর। এই দুটি জলাশয়ের পাড়েই বেশ উঁচু মাটির বাঁধ ছিল। সেখানে ৪টি কামান ও ৪৫ জন ফরাসি গোলন্দাজ সেনা নিয়ে নবাবের পক্ষের মঁশিয়ে দ্য সিফ্রে খুব সাবধানে আস্তানা গেড়েছিলেন। এখান থেকে আরও উত্তরে ৫০০ গজ দূরে মাটির একটি উঁচু ঢিবি ছিল। এখানে ছিল ঝোপ-ঝাড় ও বন। নবাবের একদল খুবই অনুগত সৈন্য এখানে শিবির গেড়েছিল। এদের কাজ ছিল নবাবের শিবিরে ঢোকার মূল পথটি আগলে রাখা। এই টিবির কিছুটা পশ্চিমে নবাবের সৈন্য-শিবিরে আরও একদল সৈন্য ছিল। নবাবের সৈন্যদের শিবির ছিল মঙ্গরপাড়ায়। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক মীরমদন তাঁর বাহিনী নিয়ে ছিলেন ফরাসি সৈন্য এবং উঁচু ঢিবির মাঝখানে। মোহনলাল এবং নবাবের অপর অনুগত সেনাপতিরাও যোগ দিয়েছিলেন মীরমদনের সাথে। এই বাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজার মোঘল অশ্বারোহী সৈন্য এবং দুটি কামানসহ সাত হাজার রাজপুত ও পাঠান সৈন্য। অন্যদিকে এই বাহিনীর বাম পাশে ইংরেজ বাহিনী থেকে অনেক দূরে ইয়ার লতিফ খান, রায় দুর্লভ রাম এবং মীরজাফর আলী খান তাঁদের বাহিনী সমাবেশ করেন। সব মিলিয়ে নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০ হাজার। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধে মাত্র ১২ হাজার সৈন্য নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। অন্যরা যুদ্ধ না করে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। অপরদিকে

ইংরেজ বাহিনীর সমাবেশের জায়গা ছিল ২০০ গজ মাত্র। এদের মাঝখানে ছিল লালরঙের পোশাক ও সাদা আড়াআড়ি বেল্ট পরিহিত ইউরোপীয় সেনাদল। দু'পাশে ছিল মাদ্রাজের তেলিঙ্গা-সিপাহী ও দেশী লাল-পল্টন নামে পরিচিত এদেশীয় সেনা। লাল-পল্টনের সেনাদের মাঝে ছিল বিহার, অযোধ্যা, দেয়াব অঞ্চল ও রোহিলা খণ্ড থেকে নিয়ে আসা পাঠান, রোহিলা, জাঠ, রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা। ইউরোপীয় সৈন্যদের চারটি দলে ভাগ করা হয়। এই চারটি দলের চার অধিনায়ক ছিলেন জেমস কিলপ্যাট্রিক, আর্চিবল গ্রান্ট, চার্লস আয়ার কুট এবং মিঃ গপ। ইংরেজদের ছিল ৬টি কামান। আর নবাবের বাহিনীতে ছিল ৪০টি কামান। তবে এই ৪০টির মধ্যে মাত্র ১২টি কামান থেকেই গোলা ছোঁড়া হয়েছিল। বাকি ২৮টি ছিল পুরোপুরি নীরব। ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সকালে নবাবের বিশাল বাহিনী ইংরেজদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। খুব ভোরে ক্লাইভ পলাশী হাউসের ছাদে উঠে নবাবের শিবিরের দিকে নজর রাখতে থাকেন। সূর্য ওঠার পর নবাবের সৈন্যরা শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। ইংরেজ বাহিনীও লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। নবাবের বাহিনীর ফরাসি অধিনায়ক সিঁফ্রের সেনারা ২০০ গজ দূর থেকে ইংরেজদের উপর কামান দাগতে শুরু করে। এতে একজন ইংরেজ গোলন্দাজ মারা যায়। ইংরেজ বাহিনীও তখন কামান দাগতে থাকে। তবে নবাবের বাহিনীর কামানের গোলা ইংরেজদের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে নি ইংরেজ সেনারা আমবাগানে গাছের আড়াল নিয়ে ছিল বলে। অন্যদিকে ইংরেজ বাহিনীর কামানের গোলায় নবাবের সেনাদলের বেশ ক্ষতি হয়। তবে নবাবের কামানের তুলনায় ইংরেজ বাহিনীর কামানের পাল্লা কম ছিল। তাই নবাবের বাহিনীর গোলন্দাজদের তেমন অসুবিধা এতে হয় নি। প্রথম আধঘন্টায় ইংরেজ বাহিনীর ৩০ জন্য সৈন্য হতাহত হয়। এ সময় ইংরেজদের গোলা বর্ষণের মুখে নবাবের অশ্বারোহী বাহিনী এগিয়ে এসে আক্রমণ করতে পারে নি। উভয় বাহিনীর মধ্যে কেবল কামানের গোলা বিনিময় চলতে থাকে। এভাবে প্রায় ৩ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে।

এদিকে সকাল থেকেই আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা চলছিল। এগারোটার দিকে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। ঘন ঘন বজ্রপাতও হতে থাকে। নবাবের বাহিনীর কামানের বারুদ ঢেকে না রাখায় সেগুলি ভিজে যায়। ফলে তা আর ব্যবহারের মতো ছিল না। ইংরেজ বাহিনী তাদের বারুদ ভালোভাবে ঢেকে রাখে। তাই সেগুলি তারা পরে ব্যবহার করতে পেরেছিল।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর নবাবের সেনাপতি মীরমদন তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীসহ ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যান। তাঁর ধারণা হয়েছিল, নবাবের বাহিনীর গোলাবারুদের মতো ইংরেজদের গোলাবারুদও বৃষ্টিতে ভিজে

নবাব সিরাজুদ্দৌলা

রবার্ট ক্লাইভ

মীর জাফর

গেছে। অতএব ইংরেজরা আর কামান দাগতে পারবে না। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল ছিল। নবাবের আগুয়ান বাহিনীর উপর ইংরেজরা কামানের গোলা বর্ষণ করতে শুরু করে। এতে নবাবের অশ্বারোহী সেনাদলের অনেকে হতাহত হয়। মীরমদন নিজে এবং মোহনলালের জামাতা বাহাদুর আলী খান, নোয়াই সিং হাজারীসহ কয়েকজন সেনা-অফিসার নিহত হলেন। মীরমদন উরুতে বেশ বড় আঘাত পেয়েছিলেন। খুবই খারাপ অবস্থায় তাঁকে নবাবের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এই ঘটনায় নবাবের বাহিনী নিরাশ হয়ে পেছনে হঠে আসে। বিশেষত মীরমদন মারা যাওয়ায় নবাব নিজে খুবই বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়েন। তবে তখনো লড়াইয়ের অবসান ঘটে নি। বেলা দুটো পর্যন্ত ইংরেজ বাহিনী ও নবাবের বাহিনীর মধ্যে গোলা বিনিময় চলতে থাকে। ইংরেজ বাহিনীর তুলনায় নবাবের বাহিনী ছিল বিশাল। কিন্তু মীরমদনের মৃত্যুর ফলে নবাবের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। আর এই হতাশাই অবশেষে কাল হয়ে দাঁড়ায় তাঁর। পরাজয়ের কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন থেকেই।

মীরমদন মারা যাওয়ায় নবাব খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। নবাবের সেনাবাহিনীতেও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ সময় মীরজাফর, রায় দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ খান তাঁদের বাহিনী নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতে সিরাজুদ্দৌলাও মনে মনে ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যে, মীরজাফর এ লড়াইয়ে তাঁকে সহায়তা করবেন না। নবাব বিচলিত হয়ে মীরজাফরকে তাঁর শিবিরে ডেকে পাঠান। তারপর মীরজাফরের কাছে তিনি করুণভাবে আবেদন করেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য। নিজের মাথার রাজমুকুট খুলে মীরজাফরের হাতে দিয়ে তিনি অনুরোধ জানান — বাংলার নবাবের রাজমুকুটের সম্মান রাখার জন্যে এগিয়ে আসতে। এ সময় নবাব নানা সময়ে মীরজাফরের সাথে তাঁর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পুরানো মতভেদ ও মনোবেদনা ভুলে গিয়ে এ ধরনের সংকটকালে শক্ত হাতে নবাবের বাহিনীকে পরিচালনা করতে মীরজাফরকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকেন সিরাজুদ্দৌলা।

তরুণ নবাবের বিনীত অনুরোধে মীর জাফরের মন নরম হয়। তিনি পবিত্র কোরান হাতে নিয়ে শপথ করেন যে, বিপদে সিরাজুদ্দৌলার পাশেই তিনি দাঁড়াবেন। এরপর তিনি নবাবকে পরামর্শ দেন সেদিনকার মতো লড়াই বন্ধ করে পরদিন নতুনভাবে আবার তা শুরু করতে। এদিকে মোহনলাল তখনো অপরিসীম সাহসের সাথে তাঁর বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। নবাবের আদেশ পেয়ে মোহনলাল অবাক হয়ে যান। কারণ সিরাজুদ্দৌলার অনুগত বাহিনী তখন মোটামুটি লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়েই ছিল। মোহনলাল তাই তাঁর আক্রমণ

চালিয়ে যেতেই চেয়েছিলেন। তবু নবাবের আদেশে তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলেন। বেলা দুটোর দিকে ময়দানে উভয় পক্ষের লড়াই থেমে যায়।

এদিকে নিজের শিবিরে ফিরে গিয়ে মীরজাফর নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকেন। বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তিনামায় তিনি সই করেছিলেন সে কথাটি তাঁর মনে ছিল। অতএব বিকেল তিনটেয় তিনি রবার্ট ক্লাইভকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি নবাবের সেনাবাহিনীর সব বিষয় জানিয়ে দেন। রাত তিনটেয় ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ পরিচালনার পরামর্শ দিলেন তিনি। চিঠিতে মীরজাফর আরও লিখলেন যে, ইয়ার লতিফ খান, রায় দুর্লভ এবং তিনি নিজে কর্নেল ক্লাইভকে সাহায্য করবেন। মীরজাফর তাঁর চিঠিতে নবাবের সেনাশিবিরের যাবতীয় বিবরণ রবার্ট ক্লাইভকে জানিয়ে দেন।

নবাবের সেনাবাহিনী পেছনে সরে যেতে থাকলে ইংরেজ সেনাপতি জেমস কিলপ্যাট্রিক নবাবের পক্ষে যুদ্ধরত ফরাসি সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য এগিয়ে যান। যুদ্ধ থামিয়ে শিবিরে ফিরে আসার আদেশ পেয়ে নবাবের সেনাদলও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ এ সময় মোহনলালের পরিচালনায় তারা ইংরেজদের বেশ অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল। মোহনলাল নিজে এ-সময় নবাবকে তাঁর আদেশ বাতিল করার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। কিন্তু মীরজাফর তাঁর পরামর্শে অটল থাকেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে, নবাব তাঁর কথা না শুনলে নবাবকে সাহায্য করতে তিনি এগিয়ে আসবেন না। সিরাজুদ্দৌলা এ-সময় মানসিকভাবে খুব দোটানার মধ্যে পড়েন। শেষ পর্যন্ত মীরজাফরের মতেই তিনি সায় দেন।

যুদ্ধের এই সময়ে চরম ভুলটিই করেন সিরাজুদ্দৌলা। মোহনলাল এ ঘটনায় চরম হতাশ হয়ে পড়েন। নবাবের সৈন্যদের মনেও যুদ্ধের ব্যাপারে সংশয় দেখা দেয়। পেছন ফেরার সময় নবাবের সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাদের মনোবলও তখন ভেঙে গিয়েছিল। অন্যদিকে ফরাসি সৈন্যরা অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। তারা জেমস কিলপ্যাট্রিকের সৈন্যদের সাথে দুঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পর সতর্কতার সাথে পিছু হঠে আসে। এর পরপরই ক্লাইভের বন্দুকধারী সৈন্যরা ফরাসি সৈন্যদের ছেড়ে যাওয়া মাটির টিবিগুলো দখল করে নেয়। এখান থেকে তারা সিরাজুদ্দৌলার পিছু হঠে যাওয়া সেনাদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ক্লাইভ নিজে এগিয়ে এসে নবাবের বাহিনীর উপর শেষ আঘাত হানতে শুরু করেন। সেনাদলের যে সামান্য অংশ তখনো অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করছিল তিনি তাদের মনোবল চূর্ণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। নিজের দুদিকে দুটি সৈন্যদল সহ একটি বাহিনী নিয়ে শেষ আঘাত হানতে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। এ সময় ইংরেজ বাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল এবং লড়াইয়ের কৌশল মেনেই তারা এগিয়ে

যাচ্ছিল। অন্যদিকে মীর জাফর , রায় দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ খানের ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী লড়াইয়ে একেবারেই অংশ না নিয়ে তাড়াতাড়ি আরও দূরে সরে যেতে থাকে। অতএব যুদ্ধ শেষ হতে খুব সময় লাগলো না। সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, কামান-বন্দুক সবকিছু ফেলে নবাবের সৈন্যরা প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করে। ইংরেজ বাহিনী তেমন কোনো বাধা ছাড়াই নবাবের শিবিরে ঢুকে পড়ে।

এ অবস্থায় সিরাজুদ্দৌলা খুবই ভীত হয়ে পড়েন। অসহায়ভাবে তিনি একটি উটে চড়ে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন। তখন বিকেল চারটে। সিরাজুদ্দৌলা বুঝতে পেরেছিলেন—মীরজাফর তাঁর সাথে প্রতারণা করেছেন। এ ধরনের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আবার সৈন্যদের একত্র করে যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো মনোবল তখন তাঁর আর ছিল না। চরম হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নিয়ে আর কোনো সংশয় তাঁর মনে ছিলও না। বিকেল পাঁচটার মধ্যেই শেষ হয় মাত্র এগারো ঘণ্টার এ যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধে নিহত-আহতদের সংখ্যা থেকে দেখা যায়, এটি ছিল আসলে প্রতারণা ও প্রহসনের এক অপূর্ব চিত্র। ইংরেজ পক্ষে যে সরকারি হিসাব সেনাপতি জন ফ্রেজার দাখিল করেন তাতে বলা হয় যে — নিহত ও আহত ৭৬, নিখোঁজ ৪। অপরদিকে নবাবের বাহিনীর প্রায় ৫০০ জন সৈন্য নিহত ও সে পরিমাণ সৈন্য আহত হয়। পরাজিত নবাবের সব রসদ এবং গোলাবারুদ ও সাজসরঞ্জাম বিজয়ী ইংরেজরা দখল করে নেয়।

সেনাবাহিনী ছেড়ে সিরাজুদ্দৌলা মাঝরাতে মুর্শিদাবাদ গিয়ে পৌছান। মুর্শিদাবাদে তখন পলাশীর খবর পৌছে গেছে। চারদিকে নেমে এসেছে ভয়ের ছায়া। রাজধানীতে শাসন বলতে কিছুই আর তখন নেই। সিরাজুদ্দৌলা নিজেকে খুবই অসহায় মনে করতে লাগলেন। সেনাবাহিনীকে আবার জড়ো করে ইংরেজদের মোকাবেলা করার মতো মনোবল তখন তাঁর আর ছিল না। বিশেষত কাকে বিশ্বাস করা যায় অথবা কাকে করা যায় না — এটিই তাঁকে বিচলিত করেছিল সবচেয়ে বেশি। সিরাজুদ্দৌলা ২৪ জুন সারাদিন মুর্শিদাবাদেই রইলেন। এরপর রাতের আঁধারে কয়েকজন খুবই বিশ্বস্ত অনুচরসহ বেগম লুৎফ-উন-নিসাকে নিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যান। সাথে তাঁর শিশুকন্যাটিও ছিল।

সিরাজুদ্দৌলার ইচ্ছে ছিল মালদহ দিয়ে পূর্ণিয়ার পথ ধরে পাটনায় যাওয়ার। গঙ্গানদীর তীরে ভগবানগোলা থেকে নৌকায় করে ৩০ জুন তিনি রাজমহলের কাছাকাছি গিয়ে পৌছান। বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের সাহায্য পাওয়ার আশা তিনি করছিলেন। তাছাড়া ফরাসি সেনাপতি জাঁ লও তখন বিহারেই ছিলেন। সিরাজের আশা ছিল রামনারায়ণ এবং জাঁ লও-এর সাথে দেখা হলে তাঁদের

সহায়তা তিনি পাবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণের কোনো সুযোগই তিনি পেলেন না।

ছোট একটি নৌকায় খুব সাধারণ পোশাক পরেই নবাব এবং তাঁর বেগম ও কন্যা যাচ্ছিলেন। ফকির দানাশা'র আস্তানার কাছাকাছি তিনি নৌকা থেকে নেমে আসেন খোলা হাওয়ায় কিছু সময় থাকার জন্যে। তাছাড়া তাঁরা সবাই তখন ক্ষুধায় কাতরও হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা নদীতীরে খাবার তৈরির আয়োজন শুরু করে। ফকির দানাশা এ-সময় নবাবকে চিনে ফেলেন। নবাবের দুর্ভাগ্য — ঐ দানা শা'র নাক ও কান কিছুদিন আগে কাটা গিয়েছিল নবাবেরই আদেশে। দানা শা নবাবকে চিনতে পেরে একটুও দেরি করলেন না। তখন রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন মীরজাফরের ভাই মীর দাউদ। তিনি খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য নিয়ে এসে সিরাজকে বন্দী করলেন। তারপর বন্দী সিরাজুদ্দৌলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মুর্শিদাবাদে। সিরাজুদ্দৌলা অবশেষে ধরা পড়লেন তাঁর নিজেরই একজন ফৌজদারের হাতে। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে জাঁ লও রাজমহলের কাছাকাছি সকড়িগলিতে এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তখন বন্দী নবাবকে মুক্ত করে আনার আর কোনো সুযোগই তাঁর ছিল না।

বন্দী সিরাজুদ্দৌলাকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আসা হয় ২ জুলাই তারিখে। তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ময়লা জামাকাপড়। তখন দুপুরবেলা। মীরজাফর নবাবের মুখোমুখি হলেন না। ছেলে মীরনের হাতে বন্দী নবাবকে দিয়ে তিনি ঘুমোতে গেলেন। মীরনের আদেশে কারাগারে মোহাম্মদী বেগ নামে একজন লোক ছুরি দিয়ে বার বার মেরে সিরাজকে ঐদিনই হত্যা করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মীরন বন্দী সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য অনেককে বলেছিল। কিন্তু কোনো আমীর-ওমরাহ সিরাজের গায়ে হাত তুলতে রাজি হন নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, মোহাম্মদী বেগকে শিশুকাল থেকে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছিলেন সিরাজের বাবা-মা দু'জনেই। মোহাম্মদী বেগ পালক পিতা-মাতার পুত্রকে হত্যা করে এভাবেই তার প্রতিদান দিয়েছিল।

পরদিন সাকালে ছুরির আঘাতে ছিন্নভিন্ন সিরাজের মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়। তারপর তাঁকে কবর না দিয়ে লাশটি বাজারের আবর্জনা ফেলার জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। পরে মীর্জা জৈন-উল-আবেদীন নামে একজন ওমরাহ সিরাজুদ্দৌলার মৃতদেহটি তুলে নিয়ে খোশবাগে নবাব আলীবর্দী খানের কবরের পাশে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বেগম লুৎফ-উন্-নিসা যতদিন জীবিত ছিলেন

খোশবাগের এই কবরের উপর প্রতিদিন সাঁঝে একটি করে বাতি জ্বালিয়ে যেতেন। বেগম লুৎফ-উন-নিসা ইন্তেকাল করেন ১৭৯০ সালের নভেম্বর মাসে।

সিরাজের জীবনের শেষ দিনগুলি যখন করুন পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পলাশীর মাঠে এবং মুর্শিদাবাদে কী ঘটছিল তার কিছু বিবরণ এবার দেওয়া দরকার। ২৩ জুন তারিখেই রবার্ট ক্লাইভ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে যান। রাতের আঁধার নেমে আসায় দাউদপুর পৌঁছে সেখানেই তাঁবু ফেললেন তিনি। পরদিন ক্লাইভ মীর জাফরকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁর ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু চিঠি পাওয়ার আগেই মীরজাফর চলে এলেন ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করতে। রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে সাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন শিবিরে। ক্লাইভ পরামর্শ দিলেন সব কাজ ফেলে সিরাজুদ্দৌলাকে আগে ধরে ফেলা দরকার। মীর জাফর তখুনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেদিনই মুর্শিদাবাদ পৌঁছলেন তিনি। ২৬ জুন মীরজাফরকে নতুন নবাব ঘোষণা করা হলো। এদিকে রবার্ট ক্লাইভ ২৯ জুন সকালবেলা ২০০ জন ইউরোপীয় ও ৫০০ জন দেশীয় সৈন্য নিয়ে বিজয়ীর বেশে মুর্শিদাবাদে এসে ঢুকলেন। হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখলো ইংরেজদের এই আগমন-দৃশ্য। সেদিন বিকেলে ক্লাইভ মীরজাফরের বাসভবন হীরাঝিলে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। মীরজাফর তাঁকে বললেন, ক্লাইভ নিজে যদি হাত ধরে বসিয়ে না দেন তাহলে তিনি সিংহাসনে বসবেন না। রবার্ট ক্লাইভ তখন হাত ধরে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। এভাবেই শুরু হয় পুতুল নবাব মীরজাফরের নবাবী জীবন।